পরিণাম

ভবানী ভট্টাচার্য্য

প্রাপ্তিস্থান :

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাণীর বরপুত্র
বঙ্গজননীর একনিষ্ঠ সাধক
অপরাজেয় কথাশিল্পী ও ঔপন্যাসিক
পরমারাধ্য শরৎচন্দ্রের পুণ্যচরণে

রথযাত্রা, ১৩৫২ সাল।
১৬, চন্দ্রনাথ সিমলাই লেন,
পোষ্ট কাশীপুর, কলিকাতা।

প্রণতঃ
ভবানী

এই লেখকের অপর বই-

বিধিলিপি

শীঘ্রই বের হবে—

অশ্রুকণা

যার যেথা গতি

বইখানাকে অঙ্গসৌষ্ঠবে
রূপায়িত কোরেছেন প্রখ্যাত
শিল্পী, বন্ধুবর তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়,
আর অন্যদিক থেকে সাহায্য কোরেছেন
শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তখনও আকাশে আলো ফোটেনি—সমস্ত প্রকৃতি অস্পষ্টতায় ঢাকা। প্রভাতের চেতনাশক্তি ধীরে ধীরে প্রাণী-জগতের মধ্যে ফিরে আসছে। চোখে তখনও লোকের ঘুমের আবেশ জড়ানো। নন্দিতা তাদের বাড়ীর সামনে কায়েমি করা ছোট্ট বাগানের মধ্যে চলাফেরা করছে। কখন বা সে কোন গাছের ছোট্ট একটা ডাল ধরে তার মসৃণ ও সুন্দর পাতাগুলোর ওপর হাত বুলাচ্ছে আবার কখনও বা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নীল নির্ম্মল আকাশের দিকে। আধ আলো ও আধ আঁধারে তাকে স্বপ্নরাজ্যের কোন রাজকন্যার মত মনে হচ্ছে। বাড়ীর সামনেই ষ্টেশন। সেখানে তেলের আলো তখনও জ্বলছে মিট মিট করে। সরুপথ দিয়ে চলেছে. কয়েকটা লোক ভোরের ট্রেণ ধরবার জন্যে। রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে এক একখানা টঙ্গা যাচ্ছে। দেখা না গেলেও, ঘোড়ার পায়ের শব্দ ও তাদের গলায় বাঁধা ঘণ্টার টুং টাং আওয়াজে সেটা বেশ অনুমান করা যাচ্ছে। নন্দিতার রাত্রিটা কেটেছে নানা দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে। কখন বা আকাশের দিকে, কখন বা ষ্টেশনের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছে তার অতীত দিনের কথা। কত না রঙ্গীন আশা, কত না সোনার স্বপন তার ছোট্ট হৃদয়খানিকে ভরে রেখেছিলো—ভেবেছিলো বোধ হয় চির-দিনই এমনি একই ভাবে কেটে যাবে। বনহরিণীর মত সে ছুটে বেড়িয়েছে, এধার ওধারে মনের আনন্দে। অন্যে তার আনন্দ দেখে ঈর্ষা করেছিল। কিন্তু এমনি বা সে কি করেছে

যে এই অল্প বয়সেই তাকে কৈশোরের সমস্ত কিছু আনন্দ ভুলে যেতে হবে।

বাঁশী বাজাতে বাজাতেএকটী যাত্রীবাহী ট্রেণ ষ্টেশনের ওপরে এসে পৌছাল। কয়েকটা লোক তাড়াতাড়ি নেমে পড়লো গাড়ী থেকে। যারা নামলো, গাড়ীতে উঠলো তার চারগুণ। গাড়ীতে যাত্রীর ভিড় ভয়ানক। ঠেলাঠেলি করে কয়েকজন গাড়ীর ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালো। যারা কিছুতেই ঢুকতে পারলো না, হাতল ধরে ঝুলতে লাগলো। যারা উঠবে বলে এসেছিলো, তারা সবাই উঠতে পারলো না। ষ্টেশনটী ছোট—গাড়ীও থামে হেথায় খুব অল্প সময়। মিনিটখানেক পরেই শোনা গেল গার্ডের বাঁশী। তার হাতের সবুজ পাখাটা কয়েকবার তুলে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলো ট্রেণ। প্রভাতের সোনালী আলো তখন গাছের মাথায় এসে পড়েছে—পাখীরা প্রভাতী বন্দনা সুরু করে দিয়েছে।

নন্দিতা কেমন আছ? একজন সুপুরুষ যুবক বাগানের গেটটা খুলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করে। পরণে তার গরদের স্যুট—হাতে একটি স্যুটকেশ।

সমরেশ বাবু আপনি! আসুন, আসুন ভেতরে আসুন।

সে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। দু'জনে বৈঠকখানায় এলো। নন্দিতা প্রথমেই কথা বল্লে, তারপর হঠাৎ কি মনে করে? কোনও খোঁজ খবরই আর নেন না। কত বছর পরে আমাদের দেখা হলো বলুন তো?

তা প্রায় বছর তিনেক হবে।

কিন্তু এভাবে আমাকে এড়িয়ে চলার মানে? নন্দিতা তার বড় বড় উৎসুক চোখ মেলে তাকায় সমরেশের দিকে।

কিছু না; শুধু সময় পাইনি নন্দিতা। কাজের ভীড়ের মধ্যে থেকে থেকে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছিলো। ভাবলুম দিন কতক ঘুরে আসি কোথা থেকে। প্রথমেই মনে পড়লো তোমাদের কথা—অনেকদিন তো তোমাদের দেখি নি।

এসে ভালই করেছেন। কিন্তু কাজের অজুহাত দেখিয়ে কি বলতে চান, যে চিঠি লেখাও আপনার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি?

তুমি বিশ্বাস করবে না, তা জানি—কিন্তু সত্যই আমি একটুও ফুরসৎ পাইনি যে চিঠি লিখি সময় মত।

আপনি কাজের লোক, তা জানি কিন্তু চিঠিতে দুটো কথা লিখে খবর নেওয়া ভদ্রতা, সেটুকুও আপনার খেয়াল থাকে না।

সমরেশ উপলব্ধি করে নন্দিতার কথাতে ঠিক সেই আগের মতনই অভিমানের সুর লেগে রয়েছে। সে ভাবে কেবল সে নিজেই বদলে গেছে—নন্দিতা আছে ঠিক আগের মতই।

নন্দিতা এতক্ষণে একখানা হাতপাখা নিয়ে সমরেশকে হাওয়া করতে আরম্ভ করেছে।

আহা থাক্ থাক্ ; হাওয়া করতে হবে না—বেশতো বাতাস বইছে।

নন্দিতা বল্লে, তা হোক্—ক্ষতি কি? যা ঘেমেছেন আপনি।

সমরেশ জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা নন্দিতা, তুমি বোধ হয় আমার ওপর খুব রাগ করেছো। মনে মনে হয়তো অনেক প্রতিজ্ঞাই করেছিলে, দেখা হলে মোটেই আমার সঙ্গে কথা কইবে না।

সত্যি আমার বড্ড রাগ হতো আপনার ওপর। ভাবতুম, পুরুষ মানুষ মেয়েদের শুধু দুঃখ দিতেই জানে—এমনি নিষ্ঠুর।

বেশ আমার দোষ হয়েছে, না হয় স্বীকার করে নিলুম। কিন্তু তুমিই বা কেমন এই দীর্ঘ তিন বছরে আমাকে এক খানা চিঠি লিখেছো?

নন্দিতা অশ্রুভেজানো কণ্ঠে উত্তর দিলো, আমি চিঠি লিখতে যাব যেচে কোন মুখে বলুন তো?

কেন তাতে হয়েছে কি? মানে খাটো হবে, এই ভয়ে?

না সে ভয় আমি করি না।

তবে? আশ্চর্য্য হয়ে সমরেশ জিজ্ঞেস করে।

শুধু দেখছিলুম আপনার ব্যবহার আর ভাবছিলুম পুরাণো দিনের কথা—মনে হচ্ছিল আমাদের পরিচয়ের ভেতর একটা মস্ত বড় মিথ্যে লুকানো—ইচ্ছে করছিলো সব কিছু ভুলে যেতে।

আমাকেও !

হ্যাঁ। অস্ফুটস্বরে নন্দিতা উত্তর দিলো। হাতের পাখাটা মাটীতে ঠক্ করে পড়ে যেতে তারা তুজনেই চমকে উঠলো।

নন্দিতার হাতের ওপর সমরেশ নীরবে একখানা হাত রেখে জিজ্ঞেস করে, আমাকে তুমি একেবারেই ভুলে যেতে পার নন্দিতা ?

কেন পারবো না ! সত্যকে যদি আপনি গলাটিপে ধরেন, আর লোক দেখানো এতটুকু পরিচয়ের চিহ্ন নিয়ে হাজির হন আমার কাছে, আপনি কি মনে করেন, আমি সেই আগের মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করবো !

বন্ধুত্বের দাবী জানিয়ে এখন যতটুকু আমরা পরস্পরের কাছ থেকে আদায় করতে পারি, ঠিক ততটুকুই আমাদের প্রাপ্য ; তার বেশী চাইলে আমাদের বিমুখ হতে হবে। কেন না আমাদের মাথার ওপর রয়েছে সমাজের রক্তবর্ণ চক্ষু, সেই সঙ্গে রয়েছে আমাদের বংশ মর্য্যাদা আর শিক্ষাভিমান এবং তার অনেক ওপরে রয়েছে, মনুষত্বের পরিচয়।

হাতের পাখাটা অকারণে নাড়াচাড়া করতে করতে নন্দিতা বল্লে, অত বড় বড় কথার ভেতর ঢোকা আমার সামর্থে কুলবে না। ওসব আমি বুঝি না। এইটুকুই শুধু জানি, এখনও আমি আপনাকে আগের মতই ভালবাসি, আপনি বাসেন কিনা আমাকে, জানি না।

আমিও বাসি নন্দিতা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নন্দিতা বল্লে, বুঝেছি সব; আর বুঝেছি বলেই তো আমার সমস্ত আসা ভরসা, সমস্ত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সব কিছু আনন্দ হাসি, আমার ফুরিয়ে গেছে—জীবনটা ভরে উঠেছে শুধু ব্যর্থতায়, হৃদয় হয়েছে ঠিক সাহারা মরু—সেখানে জল নেই, বৃষ্টি নেই, শুধু বালুঝড় আর তারই মাঝে উপস্থিত হয় থেকে থেকে মৃগতৃষ্ণা। পাগলের মত আমি ছুটে যাই একটার পেছনে। কিন্তু ভুল ভেঙ্গে গেলে আমার দুঃখের অন্ত থাকে না—কেঁদেও আমার দুঃখ কমে না।

সে আবার কি! এসব হেঁয়ালি তো আমি বুঝতে পারলুম না, সমরেশ বল্লে।

না বোঝাই ভাল। এসব কথা থাক এখন। ঐ বাবা আসছেন।

নন্দিতার কথা শেষ হতে না হতেই তার বাবা যোগেন বাবু খড়মের খট্ খট্ শব্দ করতে করতে সোজা ঘরে এলেন। কার সঙ্গে কথা কইছিস্ রে নন্দিতা?

যোগেনবাবুর বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুল ধবধবে সাদা। কিন্তু তাহলেও তিনি এখনও বেশ সবল আছেন। মাথার চুলগুলো না পাকলে এবং দাঁত পড়ে না গেলে তাঁর চেহারা দেখে কেউ অত বয়স হয়েছে ধরতেই পারবে না। তা ছাড়া, কথা কন তিনি হেসেখেলে

সকলের সঙ্গে। দুঃখ তিনি পেয়েছেন অনেক। হৃদয়ে তাঁর বিগত দিনের অনেক অশ্রুই সঞ্চিত আছে। কিন্তু তিনি তা অযথা অপব্যয় করতে চান না। সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদ করেই কাটিয়ে দেন, পাছে তাঁর দুঃখ দেখে নন্দিতাও ব্যথা পায়। দুঃখের বোঝা ও চোখের জলের তো মানুষের বিরাম নেই; তবে কেন তিনি মিছেমিছি জোর করে আনন্দের হাটে দুঃখের পসরা ফেরি করবেন। বাপ ও মেয়েতে বেশ কাটিয়ে দিচ্ছেন।

যোগেনবাবু ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই সমরেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তিনি কাছে আসতেই, নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করে বল্লে, আমি মেসোমশাই।

যোগেনবাবু তার পিঠ থাবড়িয়ে বল্লেন, আরে তুমি! সমরেশ! আছ কেমন?

আপনাদের আশীর্ব্বাদে একরকম ভালই।

তারপর হঠাৎ এতদিনে মেসোমশাইকে মনে পড়লো?

অনেক দিন আপনাদের দেখিনি—মনটা ভারী খারাপ হয়েছিলা আপনাদের জন্যে; তাই ছুটে এলুম।

তা ভালই করেছো। কিন্তু এতদিন যে কেন আসনি সেইটিই আশ্চর্য্যের কথা। দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো।

যোগেনবাবুর নির্দ্দেশ মত সমরেশ তার পাশের চেয়ারটায় বসলো। নন্দিতা সেখান থেকে কয়েক হাত

দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সমরেশের মুখের দিকে।

হাতের সংবাদ পত্রটায় কয়েক মূহুর্ত্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে যোগেনবাবু প্রশ্ন করেন, তা এখন থাকো কোথায়? করো কি?

এলাহাবাদে একটা কলেজে প্রফেসারি করছি। থাকি ওখানেই।

ভাড়া বাড়ী না মেসে?

না, কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে একটা মেসে।

কেন, বিয়ে থা করো নি? যোগেনবাবু খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করেন।

বিয়ের কথা শুনেই সমরেশের সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো। বিয়ে সে করবে না বলেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে। আনমনে সমরেশ তাকায় ঘরের ওদিকটাতে—দেখে নন্দিতা একজোড়া করুণ চোখ মেলে একই ভাবে তার দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় তিন বছর আগেকার কথা। তার একটুকু ভুল বা তুচ্ছ খেয়ালের জন্যে সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেছে। নিজের জীবন তো তার মরুময় হয়েই গেছে; সেই সঙ্গে একটা সংসার গেছে ভেঙ্গে, আর তার সাথে এক সরলা, পরম নির্ভরশীলা, পবিত্র বালিকার জীবন ব্যর্থতায় ভরে উঠেছে। যে রাজ্যে সে স্বয়ং সম্রাট হয়ে সর্ব্বসুখ লাভ করতে পারতো, সেখানে আজ

কাঙালের মত যাঞ্চা করা ছাড়া কিছুই নেই। একটা ঢোক গিলে সমরেশ উত্তর দিলো, না।

এক রকম ভাল আছ তুমি। জানতো কত আশা নিয়ে মেয়েটার বিয়ে দিলুম। কিন্তু এক দিনের জন্তেও ওকে সুখী দেখতে পেলুম না—একি আমার কম দুঃখ সমর।

প্রকাশ যে নন্দিতার ওপর দুর্ব্যবহার করবে এতো আমি স্বপ্নেও ভাবিনি মেশোমশাই—তাকে আমি ভাল ছেলে বলেই জানতুম। এখন দেখছি, আমি যদি প্রকাশের কথা না তুলতাম তা হলে হয়তো…………

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যোগেনবাবু বল্লেন, সবই ভাগ্য সমর। আমরা নিমিত্ত মাত্র। শুধু তোমার আমার কথা নয়—দুর্দ্দিন আজ সারা ভারতের তথা সারা পৃথিবীর, তা নাহলে এই যুদ্ধ, এই মহামারী, এই দুর্ভিক্ষ, এই লোকক্ষয়, রাষ্ট্রবিপ্লব, ধ্বংস যজ্ঞ পৃথিবীতে দেখা দিলো কেন? এই যে ভারতব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, এর কথা কেউ কখন কি শুনেছো? চোখে যা দেখছো সে রকম দুর্ভিক্ষের নগ্নছবি যুগ যুগান্তরের ইতিহাসে খুঁজে পেয়েছো কি? মানুষের ওপর ভগবানের যখন বিরক্তি জন্মে, তা প্রকাশ পায় এইভাবে। লোকে একমুঠো চালের জন্তে ঘরবাড়ী ছেড়ে রাজধানীর ফুটপাথ ও গাছতলাকে বেছে নিলো, রাত্রি যাপনের পরম আশ্রয়। তারা কিউ করে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে দোকানের সামনে, মাত্র একসের

চালের জন্যে (অবশ্য চতুর্গুণ দাম দিয়ে)। অনাহারে থাকতে থাকতে শরীর আসে তাদের ভেঙ্গে, হাতের পয়সা ও যায় ফুরিয়ে। তখন তাদের ক্ষুধাতুর চীৎকার 'ফ্যান দাও মা' 'এক মুঠো ভাত দাও মা' ছাড়া আর কিছুই থাকে না। যারা পারবে এইভাবে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে, উচ্ছিষ্ট, অখাদ্য ও ছাইভস্ম কিছু দিয়ে উদরের আগুনটাকে নিভিয়ে রাখতে, বিনা পয়সায় কর্পোরেশনের জল দিয়ে পেটটাকে ভর্ত্তি রাখতে, অল্প খেয়ে বা না খেয়ে হাসতে হাসতে ফুটপাথের ওপর শুয়ে আরামে ঘুম দিতে, তারাই উঠবে শেষ পর্য্যন্ত বেঁচে।

এইসব শুনতে শুনতে সমরেশের চোখমুখ ছলছল করে আসে। সে বলে ওঠে, কিন্তু এভাবে বেঁচে থাকার কি লাভ বলতে পারেন? দিনকতক আগে আমি কলিকাতায় গিয়েছিলুম—সেখানকার যা অবস্থা দেখলুম, তা বর্ণনা করে বোঝান যাবে না কাউকে। খেতে না পেয়ে লোক মারা যায় গল্পে শুনেছি কিন্তু চোখে দেখিনি। না খেতে পেয়ে মানুষ কি ভাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তা' বর্ত্তমানে কলকাতা শহরের ফুটপাথের ওপর চোখ ফেললেই দেখতে পাওয়া যাবে। সবচেয়ে সেদিন একটা দৃশ্য যা দেখলুম, তা ভাবলে এখনও পর্য্যন্ত গা শিউরে ওঠে। কোন এক গৃহস্থের রান্নাঘরের নর্দ্দামা দিয়ে ফ্যান গড়িয়ে আসছে দেখে সামনের ফুটপাথের কয়েকটি লোক ছুটলো ঊর্দ্ধশ্বাসে

সেদিকে। সেখানে পৌঁছবার আগেই তাদের মধ্যে বাক্ বিতণ্ডা, হাতাহাতি ও মারামারি হয়ে গেলো। ইতিমধ্যে দশবার বছরের তিন চারিটি উলঙ্গ ছেলে নর্দ্দমার ওপর শুয়ে পড়ে পশুর মত জিব দিয়ে ফ্যানটুকু পরম আগ্রহে চাটতে থাকে।

যোগেনবাবু ঘরে ঢোকবার কিছুক্ষণ পরেই নন্দিতা বাইরে গিয়েছিলো; হঠাৎ এখন সে ঘরে প্রবেশ করে বল্লে, বাবা!

কথায় তার যেন ধমকের সুর। যোগেন বাবু ভাবেন, তার পাগলী মা হয়তো তাকে শাসন করতে এসেছে, কোন কিছু কর্ত্তব্যের ক্রুটী হয়েছে বলে। তাই তিনি হাসতে হাসতে বল্লেন, এরি মধ্যে আবার হলো কি তোর?

তোমার আক্কেলখানার বাহাদুরী দিতে ইচ্ছা করে। সকালে উঠেই বাজে কথা নিয়ে তর্ক করতে সুরু করেছো তো?

চশমাটা খুলে খাপে ভরতে ভরতে যোগেনবাবু বলেন, বাজে কথা নয় মা—এসব অতি সত্যি কথা। বাংলার আকাশে যে দুর্দ্দিন নেমেছে, সেই কথাই আমি সমরেশের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম, তর্ক তো আমি করিনি মা।

সমরেশ এক লহমা ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় নন্দিতার দিকে। করুণ চাহনি মেলে নন্দিতা যেন জানাতে চায় কত কথা।

কিন্তু দেখ্‌ছো যে সমরেশ বাবুর এখনও মুখ হাত ধোয়া হয়নি। সারারাত্রি কেটেছে ট্রেণে। চা খাবার খেয়ে আগে উনি একটু সুস্থ হন, তারপর বেশ খানিকক্ষণ ধরে দু'জনে মিলে তর্ক কোরো যে দুর্দ্দিনটা সত্যই বাংলার আকাশে নেমেছে, না সে তার ভৈরবী ধ্বংসময়ী ছায়া মেলে সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করতে বসেছে।

যোগেন বাবু হাত নেড়ে বল্লেন, হ্যাঁ ঠিক কথা। তুমি এখন শ্রান্ত, ক্লান্ত। যাও, আর দেরী কোরো না সমর। হাত মুখে জল দিয়ে আগে একটু কিছু খেয়ে নাও, তারপর গল্প করবোখন। তারপর নন্দিতাকে বল্লেন, যাও মা আর দেরী করে কাজ নেই ; সমরকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে যাও। আমি ততক্ষণ খবরের কাগজটার পাতা উল্টিয়ে যুদ্ধের খবরটা দেখে নি।

সমরেশ নন্দিতার সঙ্গে বাড়ীর ভেতর গেলো আর যোগেন বাবু আবার কাগজে মন দিলেন।

দুই

খাওয়া দাওয়ার পর সমরেশ আর নন্দিতা লাইব্রেরী ঘরে বসে। নন্দিতার বাবা, রায়সাহেব ও নন্দিতা, উভয়েরই ঝোঁক বই পড়ার দিকে। বিদেশে কেই বা তাদের বইএর খোরাক যোগায়। এইজন্যে যে বইগুলো তাদের ভাল লাগে, তারা কিনে নিয়ে আসে। এই করেই চার পাঁচটা বড় আলমারী বইএ ভরে উঠেছে—বাড়ীটা তাদের ঠিক একটা ছোটখাট লাইব্রেরী। তবে বই বাছা ও কেনার মধ্যে এখানে একটু বিশেষত্ব আছে। সাধারণ লোকের বইপড়া মানে উপন্যাস বা গল্পের বই পড়ে চিত্তবিনোদন করা। কিন্তু এদের বাপ ও মেয়ের পড়া সে ধরণের নয়। নন্দিতা পড়ে শুধু বৈষ্ণব কবিতা এবং সেগুলোর ওপর নানা যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ সমালোচনা; আর যোগেন বাবু পড়েন ইংরেজী ডিটেকৃটিভ সিরিজ, ভ্রমণ কাহিনী, জীবন চরিত, ছোট গল্প আর ইংরেজী ও বাংলা কয়েকখানা শ্রেষ্ঠ সাময়িক ও মাসিক পত্রিকা। এই নিয়ে তাদের সময় কাটে বেশ। কোন অস্বাচ্ছন্দ্যতা তারা অনুভব করে না। কোন নির্জ্জনতা তাদের মনে হয় না।

বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে হাসিঠাট্টা নিয়ে সময় কাটানো, রায় সাহেবের ভাল লাগে না। নন্দিতাও আজকালকার আধুনিক মেয়েদের মত স্বাধীন হয়ে উঠতে চায় না, এখানে সেখানে মনের খুসিতে ঘুরে বেড়িয়ে বা গল্প গুজব করে। তবে ঘরে

থাকলেই যে সব সময় মুখের কাছে সে বই খুলে বসে থাকে, তাও না। সংসারের কাজ খানিকক্ষণ ধরে করে সে, খানিকটা সময় কাটে বাবার সেবা করতে, কিছুটা সময় বহে যায় তার উদ্দেশ্যবিহীন ও অযথা ভাবনাতে আর যখন কিছুই ভাল লাগে না, তখন অশান্ত মনটাকে জোর করে বইএর অক্ষরে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করে। সেখানে মন বসলে পর সে পড়ে চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা—অন্য কোন দিকে সে সময় মন দেবার ফুরসৎ থাকে না একেবারে।

সমরেশ একটা আলমারী খুলে এবই ওবই নাড়াচাড়া করতে করতে আপন মনে বলে ওঠে, তুমি তো দেখছি পুরোপুরি বৈষ্ণব অনুরাগী হয়ে উঠলে নন্দিতা। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, বলরাম, বৃন্দাবন, ঘনশ্যাম. রায়শেখর প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কোন বৈষ্ণব কবিরই বই বাদ নেই। হঠাৎ এত বৈষ্ণব প্রীতির উদয় তোমার মনে হলো কি করে?

এমনি; ওগুলো পড়ি ভাললাগে বলে। তাছাড়া এসব লেখার ভেতর শেখবারও রয়েছে তো অনেক কিছু।

শেখবার জিনিস তুমি শুধু এই বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে আবিস্কার করেছো বলেই কেমন আশ্চর্য্য ঠেকছে। এ ছাড়া বাংলা সাহিত্যে শিক্ষণীয় পুস্তক তো অনেক রয়েছে—কৈ সে সবের তো কিছুই দেখছি না আলমারীতে।

আর কিছু আমার ভাল লাগে না সমরেশ বাবু। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলতে, সব কিছু দুঃখকে ভুলে যেতে,

এমন সহজ ও সুখপাঠ্য পুস্তক আমি দেখি না। যখন এ রত্ন আমি আবিস্কার করিনি, প্রাণটা আমার থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠতো, কি যে ভাবতুম জানি না—মনে হতো পাগলই না হয়ে যাই শেষপর্য্যন্ত।

নন্দিতার ব্যথা যে কোনখানে সমরেশ বুঝতে পারে। কাজেই স্বান্তনা দিয়ে বল্লে, কিন্তু ভেবে কি লাভ আছে বলতে পারো। মানুষ ভেবে কিছুতেই কুল কিনারা খুঁজে পায় না কোনদিন এ সব বিষয়ের; অথচ ভাবনারও শেষ হয় না; সুতরাং যাতে সমস্ত দুঃখ ভুলে যেতে পারা যায়, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। তবেই হয়তো একঘেঁয়ে অশান্তিকর জীবনে শান্তির পরশ জেগে উঠবে।

অকপট ভাবে নন্দিতা জবাব দিলে, তাইতো আমি বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে শান্তির উৎস খুঁজে বের করেছি। সেইসঙ্গে অন্তরটা আমার অনেক হাল্কা হয়ে গেছে, স্বার্থপরতা অনেকটা ভুলে যেতে পেরেছি। সত্য যা চিরকালই সত্য—তাকে যুক্তি তর্ক দিয়ে প্রমাণ করবার কোন প্রয়োজন দেখি না। সত্য একদিন না একদিন প্রকাশ লাভ করবেই—কোন বাধাই সে মানবে না।

সমরেশ একটা বই হাতে নিয়ে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বলতে লাগলো, তোমার দুঃখ দেখে সত্যি আমার কষ্ট হয়; ভাবি বিধাতা তোমার ওপর নির্ম্মম বিচার করেছেন ভয়ানক।

উদ্ধতফণা ফণিনীর মত গর্জ্জে উঠে নন্দিতা বল্লে, বিধাতা,

ভগবান—ওসব আমি মানি না সমরেশবাবু; আর মানবোই বা কি কিসের জন্যে? আপনি বলছেন, লোকের দুঃখে আপনার অন্তর কেঁদে ওঠে। আমার হয় কিন্তু আনন্দ। কেউ কষ্ট পাচ্ছে দেখলে বা শুনলে মন আমার খুশীতে ভরে ওঠে।

সমরেশ তাকিয়ে দেখে নন্দিতার সুন্দর কোমল মুখশ্রী উত্তপ্ত লৌহের মত লাল হয়ে উঠেছে—ওষ্ঠাধর তার কাঁপছে—ঠিক যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গীগরণের পূর্ব্বাভাষ।

নন্দিতাকে যে কি ভাবে শান্ত করবে সে ভেবে না পেয়ে ধীর কণ্ঠে বল্লে, নিয়তির বিধান মেনে চলতে হবে, এমন তো কোন জোর জবরদস্তি নেই কারুর ওপর। মিছেমিছি তুমি রাগ করছো। যা হবার তাতো হয়েছে; আমাদের পরিচয়ের মধ্যে এমন ভাঙ্গন আসে নি আর আসবেও না কোনদিন। সুতরাং আমরা পরস্পরের ওপর রাগ করে বসে থাকি কেন? শোনো এদিকে এসো।

নন্দিতা তার দিকে এগিয়ে এলো; সমরেশ সামনের চেয়ারখানা দেখিয়ে বল্লে, বোসো।

সে বিনাবাক্যব্যয়ে বসলো।

সমরেশ বলতে থাকে মনে পড়ে নন্দিতা, সেই পুরোণো দিনের কথা—সেই কৈশোর যৌবনের কথা?

নন্দিতা ঘাড় নেড়ে বল্লে, পড়ে।

এখন সে সব ছেলেমানুষী বলে মনে হয়, না! একটু

থেমে সমরেশ আবার বল্লে, মনে হয় স্বপ্ন—আচ্ছা আবার সেই স্বপ্নরাজ্যে ফিরে যাওয়া যায় না ? ভারী ভাল লাগে আমার সেখানে বাস করতে। আর......আর.........

তার কথা জড়িয়ে আসে। সমস্ত রাত্রি ট্রেণে জেগে ক্লান্তিতে তার দেহমন অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো—এখন বিশ্রামের স্নুযোগ পেয়ে চোখ তুটো আসে বন্ধ হয়ে ; সে ঘুমিয়ে পড়ে।

নন্দিতা তাকিয়ে দেখে ঘুমন্ত সমরেশের মুখে ফুটে উঠেছে এক অভাবনীয় আনন্দ ; তা দেখে তারও মন ভরে উঠে পরম স্ফূর্ত্তিতে। সে উঠে সমরেশের হাতের বইখানা অতি সাবধানে তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখলো। তারপর একটা বালিস এনে সযত্নে সমরেশের মাথার নীচে দিলো। সে সুখস্পর্শ সমরেশ অনুভব করলো কিনা জানি না। তবে মুখ দিয়ে তার বের হল একটী তৃপ্তির নিশ্বাস।

পাশের একখানা চেয়ারে বসে নন্দিতা ভাবতে থাকে। চোখের সামনে তার জীবন ইতিহাসের পাতাগুলো একের পর একটা খুলে যেতে থাকে।

তিন

কলেজে পড়বার সময় কালেজি মনের ছোঁয়াছ অল্প বিস্তর সবারই হৃদয় ও মনকে রাঙ্গিয়ে তোলে। কৈশোরের চাপল্য তখন চলে গিয়ে দেখা দেয় যৌবনের গম্ভীরতা। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে মানুষ যেদিন নিজেকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে, তখন প্রকৃতির দিকে তাকালে মনে হয় সব রঙ্গীন, সবই স্বপ্ন, সব কিছু সুন্দর ও মধুর। তরুণ তরুণী এই বয়সে খুঁজতে থাকে তাদের পরস্পরের অন্তরঙ্গ সাথীকে। সেই সাথী জুটে গেলে পর কেহবা আনন্দের স্রোতে জীবন তরণী ভাসিয়ে দিয়ে অজানার পথে ছুটে চলে। আসুক পথে ঝড়ঝাপ্টা, কিছুই তারা গ্রাহ্য করবে না। তারা পরষ্পর পরষ্পরের কাছ থেকে কি পায়নি বা কি পেতে আশা করে, তারই হিসাব মেলাতে ব্যস্ত। পাওয়া না-পাওয়ার দ্বন্দ্বের মাঝেই তাদের দিন কাটতে থাকে।

ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়াশুনা করে একই কলেজে। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দুই বৎসরে সমরেশ কারুর সঙ্গে পরিচয় করবার সৌভাগ্য লাভ করেনি। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তরুণী আজ পর্য্যন্ত তার চোখে একটিও পড়েনি। মনের মন্দিরে সে যে মানসী প্রতিমার মূর্ত্তি গড়েছে, নিয়ত অশ্রুজলে সে যার উপাসনা করে, তার সঙ্গে অন্য কোন নারীর সাদৃশ্য খুঁজে

পায় না। সহসা সে বৎসর কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে একটী মেয়ে ভর্ত্তি হলো—তাকে দেখে সমরেশ সত্যই মুগ্ধ হয়ে গেলো। তার হৃদয় ও মন চঞ্চল হলো। মনে হলো তার ধ্যান ধারণার মূর্ত্তিখানি সহসা সজীব হয়ে দেখা দিয়েছে। যে কখন কোন নারীর ধরা ছোঁওয়ার মধ্যে আসে নি, তারও নিভৃত অন্তর বলে উঠলো, সত্যই তুমি অপরূপ নন্দিতা।

নন্দিতার জন্ম অভিজাত্য বংশে, তাছাড়া মা-মরা মেয়ে; সুতরাং সে খুব আদরের বলা বাহুল্য। বাপ তার নিজে মোটরে করে মেয়েকে কলেজে পৌঁছিয়ে দিয়ে যান। ছেলের দল চমকিয়ে ওঠে তাদের বিরাট 'ভকশল' গাড়ীটা পেছনে হর্ণের শব্দ করতে করতে এসে দাঁড়ালে; কয়েক জোড়া ব্যগ্র নেত্র অপাঙ্গসুন্দর ঐ তরুণীটীর ওপরে এসে পড়ে। সে নেমেই সোজা দাঁড়িয়ে পেছনে হাত বাড়িয়ে খোলা দরজাটাকে সজোরে বন্ধ করে দিতেই মোটর ষ্টার্ট নেয় আবার—ছেলেরা আর একবার চমকিয়ে উঠে পথ ছেড়ে দেয়! সোঁ করে গাড়ীখানা চোখের পলকে বড় রাস্তা পার হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। নন্দিতা কারুর দিকে বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত না করে হাইহীল জুতোর শব্দটা দ্বারা নিজের অভিজাত্য জানিয়ে দিয়ে 'কমনরুমে' ঢোকে। ছেলেদের দল থেকে শোনা যায় অস্পষ্ট কয়েকটা কথা, ধন্নি মেয়ে যা'হোক, দেমাক ছ্যাখো।

নন্দিতা সুন্দরী এবং গর্ব্বিতা—কথা কয় যেন আগুনের

ফুলকি ; দু'পাঁচজন ছেলে গিয়েছিলো তার সঙ্গে আলাপ করতে ; কিন্তু তাদের ফিরতে হয়েছে ব্যর্থ হয়ে। হয়তো কখনও মেয়েরা ধরেছে সিনেমা বা পিক্‌নিকে যাবার জন্যে দলবেঁধে, অবশ্য সঙ্গে সহপাঠী ছাত্রের দলতো আছেই। নন্দিতা সোজা তাদের জানিয়ে দিয়েছে—কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে সে পড়াশুনা করতে, হো হা করে ঘুরে বেড়াতে নয়। সুতরাং ছেলেরা তো দূরের কথা, মেয়েরা পর্য্যন্ত তার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতে সাহস করতো না। পাছে কাকে কখন কি সে বলে বসে, যার জন্যে তার দুঃখের অবধি থাকবে না। সমরেশ নন্দিতার গুণগান করতে পঞ্চমুখ ; হঠাৎ সে দিন এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেলো। প্রত্যহ যেমন আসে, সেদিনও কলেজ বসবার মিনিট দশ আগে নন্দিতার গাড়ী এসে দাঁড়ালো গেটের কাছে। নন্দিতা নেমে সেদিন সোজা ভেতরে না গিয়ে ছেলেদের দিকে এগিয়ে আসে। সঙ্গে অতনু, নন্দিতার মাসতুতো ভাই ও সমরেশের বন্ধু। ছেলেরা এ-ওর মুখচাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। সমরেশও ঐ দলেই ছিলো। নন্দিতা তার কাছে এসে হাততুলে নমস্কার জানিয়ে বল্লে, আপনার নামই সমরেশবাবু, না ?

সমরেশের তখন হৃৎকম্প সুরু হয়েছে। সে ভাবছে, তার আচরণে কি নন্দিতা কোন ত্রুটী লক্ষ্য করেছে—এই দুর্ভাবনাই তখন তার মনের মধ্যে পাক খেতে সুরু করেছে ; কাজেই কথা বলবার কোন ভাষা না খুঁজে পেয়ে শুধু নীরবে

ঘাড় নাড়ে। ছেলেরা সে সময় খানিকটা তফাতে সরে গেছে।

অতনু বল্লে কাল ভাই, এদের বাড়ী একটা পার্টি আছে—তাই তোমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছে।

নন্দিতা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা কার্ড দিয়ে বল্লে, কাল আমার জন্মতিথি—আপনি যাবেন আমাদের বাড়ীতে সন্ধ্যেবেলা।

মন্ত্রমুগ্ধের মত হাত বাড়িয়ে সে কার্ডটা নিলো। অস্ফুট ভাবে কথা বল্লে, আচ্ছা।

কয়েক পা এগিয়ে নন্দিতা পেছন ফিরে মৃদু হেসে সমরেশের দিকে তাকিয়ে বল্লে, আসা চাই কিন্তু সমরেশবাবু, না এলে ভীষণ দুঃখিত হবো।

সমরেশ জানায়, যাব বৈকি, নিশ্চয়ই যাব—আপনার জন্মতিথি, আমি যাব না!

সমরেশ যে কি বল্লে, তার অর্থ সে নিজেই বোঝে না; বুঝেছে ছেলেরা। তারা তার অসংলগ্ন কথা শুনে প্রথমে তো হেসে উঠলো। পরে তার পিঠ থাবড়িয়ে বল্লে, চীয়ার ইউ মাই বয়। এইতো সবে সুরু হয়েছে নাটকের প্রথম দৃশ্য। দৃশ্যের পর দৃশ্য হয়ে চলবে এরপর, কি জানি কখন এর যবনিকা পড়বে। মনে হয় আনন্দের মাঝেই এর পরিসমাপ্তি ঘটবে। তবে ভয় পেয়ো না বন্ধু—আমারা এ নাটকে কেহই অংশ গ্রহণ করতে রাজী নই; আমরা শুধু শ্রোতা ও দর্শক।

আমি কিন্তু··· ··· ···প্রকাশ কি একটা বলতে যাচ্ছিল ; সমরেশ ঝাঁ করে এসে তার পিঠে একটা চড় মেরে বললে, সুরু হলো তো তোদের এখন থেকে। আচ্ছা, তোরা কি তীর্থের কাকের মত বসে থাকিস, কি নিয়ে হাসির খোরাক করবি, এই চিন্তাতে ?

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে ক্লাস বসবার সময় জানিয়ে দেওয়ায়, আলোচনা তখনকার মত শেষ হলো।

সমরেশ একটু ভাবুক প্রকৃতির। নন্দিতা যে নিজে তার সঙ্গে আলাপ করবে, তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। তা'ছাড়া সেইবা কলেজের মধ্যে শুধু তাকেই নেমন্তন্ন করলো কেন ? একথা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। ভাবতে গেলে তার সব কিছু যেন ওলট পালট হয়ে যায়।

সকালে খাওয়া দাওয়া করে প্রত্যহ যেমন বের হয়, পরের দিনও সমরেশ বেরিয়ে পড়ে—অবশ্য কলেজে নয়। পরণে তার মিহি শান্তিপুরী ধুতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী ও তার ওপর একটা দামী সিল্কের চাদর। পায়ে সম্বরের নিউকাট জুতো। সঙ্গে বই না নিয়ে নিলো খান কয়েক নোট। জন্মতিথিতে নন্দিতাকে কি উপহার দেওয়া যায়, এই ভাবনাতেই তার গত রাত্রিটা কেটেছে।

প্রথমেই সে এলো কলেজ ষ্ট্রীটের একটা বড় কাপড়ের দোকানে। সেখানে একরাশ কাপড় জামা বাছাই করে কিনলো আধুনিক ডিজাইনের একটা নীল শাড়ি এবং ফিকে

ভায়োলেট রঙের একটা ব্লাউজ। নন্দিতার গৌর কান্তির সঙ্গে ঐ শাড়ি ও ব্লাউজ অতি সুন্দর মানাবে ; সমরেশ নন্দিতার ঐ রূপ কল্পনা করে নেয়। যমুনায় স্নান সেরে রাধিকা যখন নীল শাড়ি নিঙরাতে নিঙরাতে বাড়ী যাচ্ছেন, চতুর চুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ, দূরে কদম গাছের আড়াল থেকে সিক্ত-বসনা রাধিকার পরিপূর্ণ যৌবন দেখে আপন মনে বলে উঠেন, চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি, পরাণ সহিত মোর। সমরেশের ও এখন যেন ঠিক ঐ একই অবস্থা।

কাপড়ের দোকান থেকে বেরিয়ে সে গেলো একটা জুয়েলারীর দোকানে : সেখানে যত রকম ইয়ারিং ছিল, এক একটী করে সব কটাই পরীক্ষা করে এবং প্রত্যেকটী হাতে নিয়ে মৃদু দোল দিয়ে তার দিকে চেয়ে ভাবে, ঐ ইয়ারিং নন্দিতার কাণে দুললে পরে কেমন তাকে দেখাবে। যা'হোক প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ঐভাবে নিরীক্ষণ করে সমরেশ অবশেষে দুটো ইয়ারিং কিনলো। রিং দুটো বাতাসে যখন দুলবে, প্রতিবারেই তার নিটোল গালে মৃদু আঘাত করে জানিয়ে দেবে, এযে একজনের নীরব ভালবাসার প্রথম অর্ঘ্য—হয়তো এতে সে লজ্জা অনুভব করবে।

এরপর সে কিনলো আসল ফয়জাবাদে তৈরী সৌখিন ও মিহি কাজ করা এক সেট কাঁচের চুড়ি। সোনার চুড়ির তুলনায় দাম তার খুবই নগণ্য, সন্দেহ নেই ; কিন্তু পদ্মডাঁটার মত হাত দুটী ঐ চুড়িতে অপরূপ হয়ে উঠবে। সমরেশ

হয়তো কোন দিন কলেজ ফেরতা যাবে নন্দিতার বাড়ীতে। সে নিজে এক কাপ চা তৈরি করে নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রেখে সমরেশকে বলবে, চা খান। কাঁচের চুড়িগুলো হাতে টুং টাং বেজে উঠবে। তখন চা খাওয়ার থেকে সমরেশের ভাল লাগবে চুড়ির ঐ মিষ্টি মধুর আওয়াজ।

ফুটপাথ দিয়ে চলতে চলতে সমরেশ দেখলো এক ফেরিওয়ালা রাস্তায় বসে সুন্দর সুন্দর নানা রকমের টিপ বিক্রি করছে এবং কয়েকটী মেয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে তাই কিনছে— হাতে তাদের সবারই কলেজের বই। সমরেশ মেয়েদের পেছনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো এবং তারা চলে গেলে পর, সেও কতকগুলো টিপ কিনলো নন্দিতার জন্যে।

নন্দিতা নিখুঁত সুন্দরী। মাথায় তার একরাশ ভ্রমর কৃষ্ণ চুল। বিনুনি ঝুলিয়ে যেদিন সে কলেজে যেতো বড় সুন্দর তাকে দেখাতো। চলাফেরার সঙ্গে তার বিনুনিটী কৃষ্ণসর্পের মত পিঠের এপাশ ওপাশ ঘুরে বেড়াতো। খোঁপা বাঁধলে তাকে সুন্দর দেখাতো সন্দেহ নেই, কিন্তু চুলগুলি বিনুনি করে বাঁধলে আরও সুন্দর দেখাতো এবং চমৎকার দেখায়, যদি. আজানুলম্বিত চুলের প্রান্তভাগে আধুনিক রুচিসঙ্গত রেশম ও জরীর কাজকরা একটা ঝুমকো থাকে। বাতাসে সেটা মাঝে মাঝে তার বাহুর অনাবৃত স্থানে এসে আঘাত করে এক পুরাতন স্মৃতিজড়ানো শিহরণ জাগিয়ে তুলবে। এই কথা চিন্তা করে সে একটা ঝুমকো না কিনে থাকতে

পারলে না। সে চায় জন্মতিথি উপলক্ষ্যের ভেতর দিয়ে নন্দিতার অন্তরে তার মনে-পড়া না-পড়ার একটা ছাপ এঁকে রাখতে।

সবশেষে সমরেশ গেলো নিউমার্কেটে—তখন প্রায় বেলা চারটে বাজে। টাকা থেকে যা বেঁচেছিলো, তা দিয়ে সে কিনলো নানা রঙের ফুল, তোড়া ও বোকে অনেক দোকান ঘুরে এবং বহু পছন্দ করে।

উপহার নিয়ে সমরেশ যখন নন্দিতাদের বাড়ী এসে পৌঁছিল তখন ঠিক সন্ধ্যে হয়েছে। বাড়ীঘর ব্ল্যাক আউট ও যুদ্ধকালীন আলোক নিয়ন্ত্রণ করা সত্ত্বেও যতদূর পারা যায় আলোক মালায় সজ্জিত করা হয়েছে। বাড়ীর ফটকের ওপর মনোরম তোরণ তৈরি হয়েছে। ভেতর থেকে নৃত্যগীতের মধুর সুর ভেসে এসে প্রাণে আনন্দের হিল্লোল জাগিয়ে তোলে। গেট পার হয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখা গেল নন্দিতা বড় হল ঘরটার দরজায় দাঁড়িয়ে অতিথি ও অভ্যাগতদের আদর আপ্যায়িত করছে। ঘরের ভেতরটা ও আধুনিক রুচি-সঙ্গত শ্রীমণ্ডিত করে তোলা হয়েছে। ঘরের ভেতরে তাদেরই কলেজের একটী মেয়ে তখন একখানা রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে।

সমরেশকে দেখতে পেয়েই নন্দিতা হো হো করে হেসে ওঠে। সমরেশ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দু'হাত প্রসারিত করে যতগুলো জিনিস নেওয়া যায় সমরেশ তা নিয়েছে এবং

পাছে কোনটা পড়ে যায় সে বিষয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে তাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে।

এ রকম ভাবে জিনিষগুলো না এনে একটা ঝাঁকা মুটে করলেই পারতেন। অনর্থক কতকগুলো টাকা খরচ করতে গেলেন, কেন বলুন তো? হাসি থামিয়ে সমরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে নন্দিতা বললে।

না, এমন আর কি জিনিস! শুধু গোটাকতক ফুল বৈ তো নয়; বাজারে ঘুরতে ঘুরতে পছন্দ হয়ে গেলো, নিয়ে এলুম।

যাক আপনার পছন্দের প্রশংসা না করে থাকতে পারলুম না। এখন দিন দেখি কতকগুলো জিনিস আমাকে। সমরেশের হাত থেকে কয়েকটা জিনিস হাতে নিয়ে বললে, আস্থন আমার সঙ্গে।

তারপর হলঘরে উপহারের টেবিলটা দেখিয়ে বললে, রাখুন আগে ওগুলো এখানে। সমরেশ সেগুলি রাখলে পর নন্দিতা সমবেত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকের সঙ্গে তার পরিচয় করে দিলো। বড় ভাল লাগলো সমরেশের তাদের সঙ্গ ও পরিবেষ্টনী। আহারাদি শেষ করে সমরেশ যখন বাড়ী ফেরে, গির্জ্জার বড় ঘড়িটাতে তখন ঢং ঢং করে দুটো বাজলো।

এই জন্মতিথি উপলক্ষ্য করে দুজনের পরিচয় হলো এবং দিনে দিনে সে পরিচয় গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকে অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে।

প্রকাশ ছিল সমরেশের অন্তরঙ্গ বন্ধু ; সেও ঐ কলেজেই পড়তো। সমরেশের সঙ্গে পরিচয়ের যোগসূত্রে নন্দিতার সঙ্গে প্রকাশেরও আলাপ হলো। তিনজনে তারা অনেক সময় নানা রকম হাসি ঠাট্টা করেছে। তাদের অন্তরঙ্গতা দেখে অনেকে মুচকি হেসেছে ; বিদ্রূপ করেছে আরও অনেকে। কিন্তু তাদের মনে কোন সঙ্কোচ জাগেনি কোনদিন। কোন দুঃসাহসের কথা তাদের মনে উদয় হয় নি মুহূর্ত্তের জন্যে। যুবক যুবতীর মধ্যে এই অবাধ মেলামেশার জন্যে তাদের প্রাণের সমস্ত দীনতা, মনের অপূর্ণতা শান্তি ও তৃপ্তির পরম মুক্তি পেয়েছিল। অন্তর পেয়েছিলো গোপন আনন্দের আভাষ—আত্মা দেখেছিলো মুক্তি পথের আলো। তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিলো, নিবিড় ভালবাসার অনন্ত সমুদ্র। তাদের ভালবাসায় কোন পাপ ছিল না—কোন আবিলতা এসে তাকে কলুষিত করতে পারে নি। শিশিরস্নাত শরতের প্রস্ফুটিত কুসুমের মত সে ছিল পবিত্র ও সুন্দর। কামনা ও বাসনা কাহার মনের দুয়ায়ে এসে প্রার্থনা জানায় নি! প্রকাশ ও সমরেশের উভয়েরই ভাললেগেছিলো নন্দিতাকে। কি সহজ শান্ত তার ব্যবহার, কি পবিত্র তার স্নেহ, কি সরল তার যুক্তি, কি নিরুপম তার চেহারা আর কি মধুর তার চাহনি। উভয়েরই অন্তর একের অন্তরালে গোপনে অত্যন্ত সন্তর্পনে ঐ একটী মেয়েকে চেয়েছিলো জীবন পথ যাত্রার সাথী করতে। কিন্তু সে প্রেম ছিল সম্পূর্ণ অব্যক্ত।

আত্মনিবেদনে যেখানে সুখ আছে, পরের কাছে বিলিয়ে দিয়ে যে আত্মার শান্তি, পাওয়ার চেয়ে নাপাওয়ার আনন্দ যেখানে বেশী, এ সেই স্বর্গীয় প্রেম।

নন্দিতার মনের আরসীতে তুজনকারই মূর্ত্তি ফুটে ওঠে। তু'জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, এ বিচার সে করতে পারে না। একজনের সঙ্গে যখন সে কথা কয়, ভাষা হয় তার স্বচ্ছ ও সাবলীল। কিন্তু উভয়ের মাঝখানে থাকলে, তু'জনে যেন কোন অদৃশ্য শক্তিতে তাকে তুই বিভিন্ন দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। মাঝে মাঝে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

চার

মাত্র পাঁচবছর আগেকার কথা——বিকেলে প্রত্যহ যেমন যেতো সমরেশ ও নন্দিতা গেছলো ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে। তু'জনে তারা একটা বেঞ্চে বসে আছে। তাদের পরিচয় তখন নিবিড় হয়ে ভালবাসায় রূপ নিয়েছে। নন্দিতা চায় সমরেশকে বিয়ে করতে আর সমরেশ তাকে পত্নীভাবে পেলে, জীবনের দিনগুলো হেসে খেলে কাটিয়ে দিতে পারে। যোগেন বাবুও এ বিয়েতে মত দিয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে বিয়েটা

তাদের তাড়াতাড়ি হয়ে গেলেই ভাল। সমরেশ চিরকালই একগুঁয়ে প্রকৃতির। হঠাৎ সেদিন বন্ধু মহলে তর্ক করতে করতে, সে বিলেত যাবে, প্রতিজ্ঞা করে ফেললো। সমরেশের টাকা আছে যথেষ্ট এবং পৃথিবীতে তার বৃদ্ধা এক পিসিমা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই; তা আবার তিনি থাকেন তাঁর শ্বশুর বাড়ীতে। সুতরাং তাকে বাধা দেবার কেহই নেই। নন্দিতার মতামতটা সমরেশ না নিয়ে থাকতে পারলে না। পার্কে গিয়েই সেদিন নন্দিতাকে সে খবরটা দিয়েছে। নন্দিতা অনুমতি দেওয়াতো দূরে থাকুক, আপত্তি করলে যথেষ্ট।

ফাগুণের বাতাস ঝির ঝির করে বইছে। চারিধারে গাছে গাছে ফুল ফুটে প্রকৃতির মধ্যে নব চেতনা ও নূতনের সারা এনে দিয়েছে। দূরে পুকুরধারে বকুল গাছটার ওপর বসে একটা কোকিল অবিশ্রাম ডেকে চলেছে—সামনে কয়েকটা ছেলে প্রাণের আনন্দে ছুটোছুটি করছে। কিন্তু নন্দিতার যেন এতটুকু আনন্দ নেই। সে সমরেশের দিকে পিছন ফিরে মুখ ভার করে বসে রইলো।

সমরেশ তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে মৃদু চাপ দিতে দিতে বললে, ছিঃ নন্দিতা! মিছেমিছি তুমি রাগ করছো আমার ওপর। মাত্র তো দুটী বৎসরের জন্য আমাদের মধ্যে ব্যবধান। ফিরে এসে তোমার কাছ থেকে একদিনও আমি দূরে থাকবো না। তখন যদি যাই, তোমার যা খুসি আমাকে বোলো।

নন্দিতা তার অশ্রুসজল চোখ দুটো একবার সমরেশের মুখের পানে তুলে বললে; কিন্তু এই দীর্ঘ দু'বৎসর আমি কি করে কাটাবো তাতো ভেবে পাচ্ছি না।

কেন আমাদের চিঠি আমরা পাব প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ একখানা করে। আমাদের অন্তরের আবেদন ও অকথিত বাণী চিঠির ভেতর দিয়ে আমাদের কাছে এসে হাজির হবে। তা'ছাড়া বিরহের সেতু পার না হলে পূর্ণমিলনের আনন্দ পাওয়া যায় না, একথা তুমিও জান নন্দিতা।

সমরেশের হাতদুটো শক্ত করে ধরে সে বল্লে, জানি সমরেশ বাবু। কিন্তু কি জানি কেন, তোমার বিদেশে যাবার কথাটা শুনে অবধি মনটা আমার কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মনের মধ্যে শুধু একটা ঝড় বইছে ; যত ভাবছি মনটাকে শক্ত করবো, তবু যেন অশ্রু এসে কণ্টরোধ করছে। মনে হচ্ছে স্বপ্ন বোধ হয় আমার ভাঙ্গলো, খেলা বোধ হয় শেষ হলো—জীবনটা আমার চিরতরে ব্যর্থ হয়ে গেলো। মনতো আমার কোনদিন কোন বিষয়ে এত খারাপ হয়নি। জানি না, কি দুর্ভাগ্য আমার ভাগ্যে আছে।

নন্দিতা সমরেশের কোলের ওপর মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলোতে বুলোতে সমরেশ বল্লে, জগতে ঝড় ঝাপ্টার মধ্যে দিয়ে জীবনকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে—এতটুকুতে দুর্ব্বল হলে তো চলবে না।

কিন্তু নাইবা তুমি গেলে! তোমাকে সাত সমুদ্দর পারে

যেতেই বা কে মাথার দিব্বি দিয়েছে। এতে তোমার কি লাভ বলতে পারো, নন্দিতা বল্লে। সে চায় সমরেশকে কাছে রাখতে। তাকে সে চোখের আড়াল করতে চায় না।

নন্দিতার কথার উত্তরে সমরেশ বল্লে, কিছু না, শুধু সখ, সাধারণে থিয়েটার বায়স্কোপ দেখে আনন্দ পায়, আমি পাই পড়াশুনার মধ্যে ডুবে থাকলে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নন্দিতা বলে, তুমি যাবে যাও—আমি বাধা দেবো না। কিন্তু কবে যাবে, তাও কি ঠিক করে ফেলেছো ?

দিন স্থির না থাকলে ও খুব বেশী দেরী হবে না। সেজন্যে দু'-পাঁচ দিন ঘোরঘুরি ও তদ্বির করতে হবে।

এমনি সময়ে প্রকাশ সেখানে উপস্থিত হলো। সমরেশকে মাঠে দেখে জিজ্ঞেস করে, বেড়াতে এসেছিস বুঝি—ওঃ আপনিও এসেছেন, নন্দিতার দিকে তাকিয়ে বল্লে। নন্দিতা মৃদু ঘাড় নেড়ে জানায় হ্যাঁ।

হাতের টিথিসকোপটা ঘোরাতে ঘোরাতে প্রকাশ জিজ্ঞেস করে, কি রে তবে যাওয়াই ঠিক করলি ?

হ্যাঁ ঘুরিই আসি! দুটো বছর তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

যাবার যখন মন হয়েছে তোর, তখন তোকে বাধা দেওয়া শক্ত। তারপর প্রকাশ নন্দিতাকে লক্ষ্য করে বল্লে, আমার এই বন্ধুটী একটু অদ্ভুত ধরণের—একে বোঝা শক্ত।

আমি জানি প্রকাশ বাবু।

ঘাড় নেড়ে প্রকাশ বল্লে, আচ্ছা, আপনারা বসুন। আমি এধারে রোগী দেখতে এসেছিলুম। হঠাৎ দেখা হয়ে যেতে দুটো কথা কইলুম। দু'চার পা এগিয়ে মাথা থেকে টুপিটা খুলে হাতে করে নাড়তে নাড়তে প্রকাশ বল্লে, চীয়ার ইউ।

নন্দিতা মুখ তুলে তার দিকে তাকালো—মুখে তার দেখা দিলো মৃদু হাসি। জ্যোৎস্নার আলো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছিলো নন্দিতার মুখের ওপর—সুন্দর মুখ তাতে অপরূপ দেখাচ্ছিল। মূহুর্তের জন্যে সে দিকে তাকিয়ে প্রকাশ চল্লো, নিজের কাজে।

প্রকাশ চলে গেলে সমরেশ বল্লে, কি নন্দিতা, তুমি এখনও মুখভার করে বসে থাকবে?

নন্দিতা কোন কথা কইলো না।

সমরেশ তার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে ডাকলো, নন্দিতা।

উত্তর না দিয়ে সে উঠলো আবার কেঁদে।

তার কাঁধের ওপর একখানা হাত রেখে সমরেশ বল্লে, আমি তোমায় সত্যি ভালবাসি; কিন্তু তাই বলে যে তোমাকে বিয়ে করতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। তুমি যদি আমাকে বিয়ে করতে না চাও, তা নিয়ে আমি তোমার কাছে কোনদিন অভিযোগ জানাবো না।

তোমাকে সুখী দেখলে আমি সব চেয়ে বেশী আনন্দিত হবো।

নন্দিতা মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বল্লে, এসব তুমি কি বলছো আমি বুঝতে পার্চ্ছি না।

বুঝতে পারার দরকার নেই। কিন্তু আর না চলো—এবারে ফেরা যাক্।

সমরেশ উঠলো দেখে নন্দিতাও উঠে দাঁড়ালো। সারা পথ আর তাদের কোন কথা হলো না। সমরেশের কথার কোন অর্থই নন্দিতা বুঝতে পারলো না—সমস্তই মনে হয় একটা বিরাট প্রহেলিকা।

পাঁচ

যোগেনবাবু সমরেশের হাতে নন্দিতাকে সমর্পণ করবেন, এ কল্পনা তিনি অনেক দিন আগেই স্থির করেছেন। রূপে গুণে সমরেশের মতো ছেলে পাওয়া শক্ত; তা' ছাড়া পিতৃ-পুরুষের সঞ্চিত বেশ কিছু টাকাও তার হাতে আছে। মেয়ের সেজন্য ভবিষ্যত জীবনে কোন কষ্টই হবে না। সমরেশ যোগেনবাবুকে যথেষ্ট সম্মান করতো, আর তিনি তাকে

পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। যোগেনবাবুর ঐ এক মেয়ে—ছেলেপুলে আর নেই। স্ত্রী মারা গেছেন বছর দশেক আগে। কাজেই মা-মরা মেয়ের সমস্ত দায়িত্বই তিনি গ্রহণ করেছেন নিজে। মেয়ের সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করেননি। অথচ যখন নন্দিতার মা মারা যান তখন তার বয়স সবেমাত্র চার বৎসর। অন্ততঃ ঐ বালিকাকে মানুষ করে তোলবার জন্যেও অনেকে তাঁকে বিয়ে করতে বললেন। কিন্তু যোগেনবাবু নন্দিতাকে মানুষ করবার জন্যে একজন নার্স নিযুক্ত করলেন। নন্দিতার ফাইফরমাস খাটবার জন্যে এখনও সে তাদের সংসারে। সংসারের কাজ-কর্ম্মের জন্যে আছে বামুন চাকর। সব কিছু তত্ত্বাবধানের ভার যোগেনবাবুর বিধবা ভগিনী অনুপমার ওপর।

সেদিন সকালে চা পান করতে করতে সমরেশ বল্লে, মেসোমশাই, ভাবছি আমি বিলেত যাব।

হাতের পেয়ালাটা টেবিলের ওপর ঠক্ করে রেখে যোগেনবাবু জিজ্ঞেস করেন, বিলেত যাবে—কিন্তু কি দরকার?

পি, এইচ, ডি পড়তে।

পড়াশুনা করতে যাবে—সে তো ভাল কথা। কিন্তু আমি বলি কি, বিলেত যদি যেতে হয়, মাস কয়েক না হয় পরেই যেয়ো। আমি যে সামনে বোশেখ মাসেই তোমাদের বিয়ে দেবো ঠিক করে ফেলেছি। তাছাড়া

নন্দিতাও বড় হয়ে উঠেছে এবার—আর কতদিন ওকে রাখবো আমার সংসারে বেঁধে। তোমার হাতে ওকে দিতে পারলে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হই।

আপনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন ; সেজন্য সত্যই আমি কৃতজ্ঞ। তাই, আমার একান্ত অনুরোধ, আমাকে যেতে অনুমতি দিন আর সেই সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি কৃতকার্য্য হয়ে ফিরতে পারি।

ভগবান তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। কিন্তু আমি বুড়ো হয়েছি—কবে আছি, কবে নেই। যাবার আগে মেয়েটাকে সুখী দেখে যেতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হতুম।

আপনি দেখছি নন্দিতার বিয়ের জন্যে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ওর বিয়ে যদি তাড়াতাড়ি দেবার মনে করে থাকেন, আমি একটী ভাল পাত্রের সন্ধান দিচ্ছি। আমার বন্ধু, প্রকাশকে আপনি দেখেছেন নিশ্চয়ই। ছেলেটী ডাক্তারি পড়তো ; নন্দিতার অসুখের সময় এ বাড়ীতে সে এসেছে দু'চারবার। ছেলেটী সত্যই বড় ভাল। আমি বলি কি প্রকাশের সঙ্গে নন্দিতার বিয়ে দিন—দু'জনেই ওরা সুখী হবে। আর আমি! আমিই তো এ বিয়ের ঘটক—আমার আনন্দতো সবচেয়ে বেশী, বলে সমরেশ মৃদু হাসবার চেষ্টা করলো। অলক্ষ্যে নিয়তিও হেসে উঠলো।

নন্দিতা এমনি সময়ে খবরের কাগজটা হাতে করে ঘরে ঢুকছিলো। সমরেশের কথাগুলো চাবুকের মত তাকে

আষ্টেপৃষ্টে আঘাত করলো। যে গতিতে সে ঢুকছিলো সেই ভাবেই সে ফিরলো নিজের ঘরে। সেখানে গিয়ে সে কাগজখানাকে ছুঁড়ে মাটীতে ফেলে দিলো; তারপর বিছানার ওপর মুখ গুঁজে শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্লে, প্রতারণা, শুধু প্রতারণা। পুরুষ তুমি এত নির্ম্মম!

তাড়াতাড়ি জবাব দেবার মতো যোগেনবাবুর মনের অবস্থা নেই। সমরেশ যে কেন এই সময়ই বিলেত যেতে চায়, তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। ভাবেন হয়তো সে নন্দিকে বিয়ে করতে রাজী নয়। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে ঠাণ্ডা চায়ে আর একটা চুমুক দিয়ে বল্লেন, হ্যাঁ প্রকাশ ছেলেটীও মন্দ নয়—শুনেছি নন্দিতার সঙ্গে পরিচয়ও আছে। সবই হবে শেষ পর্য্যন্ত তবু যেন কেমন মনে হচ্ছে আমার।

আপনি আর অন্য মন করবেন না। নন্দিতার বিয়ের জন্য ভাবছিলেন—পাত্রের তো সন্ধান পাওয়া গেলো। প্রকাশকে রাজী করাবার ভার রইলো আমার ওপর। আপনি যদি তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন, আমি না হয়, কিছুদিন পরেই যাব।

যে সমরেশ নন্দিতা ছাড়া আজ পর্য্যন্ত অন্য কোনও মেয়েকে ভালবাসতে পারে নি, সে আজ অপরের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে ব্যস্ত কেন? প্রকাশ যে নন্দিতাকে ভালবাসে, এ কথাটা প্রকাশ মুখ ফুটে তাকে না বললেও সে জানতে পেরেছে। এখন নন্দিতাও যদি তাকে সমরেশের চেয়ে অধিক

ভালবাসে, তাদের মধু মিলন শীঘ্র সুসম্পন্ন হোক, এই তার ইচ্ছে। সমরেশের ওপর নন্দিতার সত্যিকার ভালবাসা থাকলে, নিশ্চয়ই সে এ বিয়েতে অমত করবে। আর যদি মোহ বশে সে সমরেশকে ভালবেসে থাকে, তাহলে প্রকাশকে বিয়ে করে সাংসারিক জীবনে সুখী হবে। নন্দিতা যদি ভুল করে থাকে, সমরেশই বা সে ভুলের ওপর ভিত্তি করে জীবনটাকে দুঃখময় করে তুলবে কেন? সমরেশ ভাবে এই প্রস্তাবেই নন্দিতার মন যাচাই করবার একটা সুযোগ মিলবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যোগেনবাবু বল্লেন, এখন আমি এ বিষয়ে পাকা কথা দিতে পারছি না সমর। আমি ভেবে দেখি, তা'ছাড়া নন্দিতাকে জিজ্ঞেস করি। সে যদি রাজী হয় তবেই তো।

নিশ্চয়ই। সে শিক্ষিতা; সুতরাং জীবনের ভালমন্দ তার বোঝবার শক্তি আছে। আপনি তাকে বুঝিয়ে বলবেন আর সেও ভেবে দেখুক ভাল করে। তারপর যা কর্ত্তব্য হয় করা যাবে।

সমরেশ তারপর চলে যায় আর যোগেনবাবু চিন্তামগ্ন ভাবে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে থাকেন।

ছয়

সমরেশ ভেবেছিল নন্দিতাকে ছাড়া কাউকে সে বিয়ে করবে না। তারা উভয়েই জানতো যে তারা পরস্পর পরস্পরের স্বামী-স্ত্রী। ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেলো বিপরীত দিকে। সমরেশ নন্দিতার কাছ থেকে চলে গেলো দূরে। সে যাবার আগে নন্দিতার সঙ্গে বিয়ের কথা পেড়ে গেলো তারই অন্তরঙ্গ বন্ধু, প্রকাশের সঙ্গে। যোগেনবাবু তা নিয়ে ভাবলেন অনেক কিন্তু কিছুতেই কিছু স্থির করে উঠতে পারলেন না। সমরেশের সঙ্গে ভাল ভাবে তাঁর পরামর্শ করাও হলো না। যাবার আগে সে যোগেনবাবু বা নন্দিতার সঙ্গে দেখাও করে যেতে পারলো না। লোক মারফৎ শুধু এক টুকরো চিঠি পাঠালো যোগেনবাবুর কাছে।

রাত তখন আটটা হবে ; যোগেনবাবু বৈঠকখানায় বসে একটা মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিলেন, এমন সময় একজন লোক এসে একটা চিঠি দিলো। তিনি পড়ে দেখলেন সমরেশ লিখেছে—

মেসোমশাই, হঠাৎ জাহাজ ছাড়ার খবর পেয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লুম যাবার জন্যে। তাড়াতাড়িতে আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ, এমন কি দেখা করেও আসতে পারলুম না বলে

বিশেষ দুঃখিত; আশা করি কিছু মনে করবেন না। যদি কোন অপরাধ করে থাকি, ক্ষমা করবেন তার জন্যে। আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন। আর নন্দিতাকে··· ।

ইতি—

সমর।

চিঠির শেষের দুটো কথা কাটা।

নন্দিতা তখন বেড়িয়ে সবে মাত্র ঘরে ঢুক্‌ছে। আগন্তুক তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢুকেই লোকটীর আপাদমস্তক একবার দেখে নন্দিতা জিজ্ঞেস করে, বাবা, কে এ লোকটী? চিনতে পারছি না তো?

যোগেনবাবু প্রথমে তার দিকে, তারপর হাতের চিঠিটার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, ও আসছে সমরেশের কাছ থেকে।

কেন, খবর কি তাঁর? এক অজানা আতঙ্কে তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

চিঠিটা তার হাতে দিয়ে যোগেনবাবু বল্লেন, এইটে পড়, তাহলে সব বুঝতে পারবে। তারপর তিনি আগন্তুকের দিকে ফিরে বল্লেন, আচ্ছা, তুমি যাও।

লোকটা নমস্কার করে চলে গেলো।

কয়েকদিন ধরেই নন্দিতার মন ভাল নয়। সমরেশ যে এভাবে তাকে ব্যথা দেবে, একথা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। অভিমানে তার অন্তর একেবারে ভেঙ্গে

পড়ে। পুরুষ জাতির ওপর তার রাগ হয় ভয়ানক। কেন না, তারা জানে শুধু নারীর দুর্ব্বলতাটুকুর ওপর ভিত্তি করে সুযোগ আর সুবিধা গ্রহণ করতে। নন্দিতা ভাবে তারা সবাই ভালবাসার ভান করতে পটু কিন্তু আসলে তারা মোটেই ভালবাসতে জানে না। আর মেয়েরা তাদের অন্তরের সব কিছু প্রেম ভালবাসা প্রিয়-তমের পায়ে ঢেলে দিয়ে মধুমিলনের জন্যে বসে থাকে নিভৃত ধ্যানে। মেয়েদের এরকম ভালবাসা পেয়ে হঠাৎ খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে কোন পুরুষ যদি তাকে ত্যাগ করে চলে যায়, মেয়েদের কি তাহলে রাগ হওয়া অসম্ভব? নন্দিতার রাগের সঙ্গে হয় ঘৃণা। সে ভাবে মেয়েরা কি সব মাটীর পুতুল। পুরুষরা তাদের যে ভাবে ইচ্ছে নিয়ে খেলা করবে! ভেঙ্গে গেলে বা রঙ চটে গেলে পথের ধুলোয় ফেলে দিয়ে চলে যাবে। নন্দিতা মনে মনে বলে, কাপুরুষ।

খানিকক্ষণ চিঠিখানাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার পর নন্দিতা চীৎকার করে বলে ওঠে, বাবা, আমার বিয়ের কথা নিয়ে সমরেশবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করবার প্রয়োজন নেই। তিনি এত কাজের লোক হয়েছেন যে একবার দেখা করে যাওয়াটাও প্রয়োজন মনে করলেন না।

ওই তো তোর দোষ মা—সবতাতেই লোকের অন্যায় দেখিস। সময় পায়নি, না হলে একবার আমার সঙ্গে

দেখা করতো না যাবার আগে? যাক সে কথা—আচ্ছা, প্রকাশ ছেলেটীকে তোর কেমন মনে হয়?

সমরেশবাবুরই তো বন্ধু—ঐ এক রকমই হবেন নিশ্চয়ই।

যোগেনবাবু একথার বিদ্রূপটুকু ঠিক বুঝতে না পেরে বল্লেন, আরে সে তো আমি জানি! আমি জিজ্ঞেস করছি—ছেলেটীর কথাবার্ত্তা, চালচলন, আচার ব্যবহার বেশ ভাল তো?

দেখে তাইতো মনে হয়। অন্যমনস্ক ভাবে নন্দিতা জবাব দিলো।

হাসতে হাসতে তিনি বল্লেন, হতেই হবে, বড় ঘরের ছেলে। আচ্ছা, ছেলেটী বেশ নম্র ও বিনয়ী, নারে নন্দিতা?

নন্দিতা মুখ ঝামটা দিয়ে বলে ওঠে, বাবারে বাবা, পারি না। কোথায় বসে একটু দু'জনে গল্প করবো, তা নয় হাকিমের মত জেরা সুরু করে দিলেন! এইটুকু শুধু আমি বলতে পারি, যে প্রকাশবাবু লোক হিসেবে খুব ভাল; এমন কি সমরেশবাবুর চেয়ে। এইবলে সে চলে যায়।

আবার এখনি চল্লি কোথায়; বস না এখানে।

নন্দিতা ওপরে উঠতে উঠতে বল্লে, আসছি এখুনি।

তারপর তিনি ডেকে পাঠালেন একদিন প্রকাশকে—অনেক কথা হলো তার সঙ্গে। ছেলেটীর ব্যবহারে তিনি

সত্যই মুগ্ধ হলেন। প্রকাশও তাদের বাড়ীতে আসতে লাগলো কাজে, অকাজে। যোগেনবাবু ভেবে চিন্তে শেষে পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেললেন নন্দিতার বিবাহের। বাড়ীতে স্বর্ণকার, কাপড়ওয়ালা, বাসনওয়ালা, মুদী প্রভৃতির ঘনঘন যাতায়াত স্বুরু হলো। সবশেষে এলো ম্যারাপ-ওয়ালা। উঠান ও ছাদ হোগলা দিয়ে ঘিরে ফেলা হলো—সেখানে ব্ল্যাক আউট শেড দিয়ে চারিধারে জ্বলে উঠলো আলো। সপ্তাহ খানেক আগে থেকেই নহবৎ বাজছে বাড়ীতে।

সন্ধ্যা থেকেই বাড়ীখানা লোকে গমগম করছে। হঠাৎ একসময় একখানা মোটর এসে থামলো গেটের কাছে। জনতা গাড়ীর চারিপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। শঙ্খ আর হুলুধ্বনিতে আকাশ বাতাস মেতে উঠলো। গাড়ী থেকে নামলো আমাদের ডাক্তার প্রকাশ। পরণে তার গরদের কাপড় ও জামা—গলায় কোঁচান চাদর, হাতে টেথিস-কোপের বদলে রূপোর জাঁতি। যোগেনবাবু নিজে এগিয়ে এসে হাত ধরে তাকে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেলেন।

সাত

রাত নিশুতি—সমরেশ ঘুমুচ্ছে অঘোরে। হঠাৎ খট্ করে কি একটা শব্দ হতেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। অন্ধকারেই ঘরটার চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে ভাবলে ও কিছু নয়; পাশ ফিরে শুয়ে সে চোখ বুজলো। তারপর সে অনুভব করলো একখানি সুকোমল কম্পিত হাত তার গায়ে ঠেকেছে—মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে কে যেন ডাকছে, সমরেশ, সমর, তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো?

ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতে না পেরে সে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে—ঝুন্‌ঝুন্ করে শোনা গেলো চুড়ির মিষ্টি আওয়াজ। কে? বলে সমরেশ বেড সুইচ টিপলো।

আমি; বাঘ নই, ভালুকও নই যে একেবারে লাফিয়ে উঠেছো। তখনও তার হাত সমরেশের গায়ের ওপর।

সমরেশ নন্দিতার হাতখানা গা থেকে নামিয়ে বিছানার ওপর রেখে দিয়ে বল্লে, না ভয় আমি পাইনি, তবে চমকে উঠেছিলাম একটু সত্যি। কিন্তু এত রাত্রে, এ ভাবে লুকিয়ে একেলা আমার শোবার ঘরে আসার অর্থ কি, একটু বুঝিয়ে বলবে আমাকে?

কিছু না, এমনি, নন্দিতা মুচকি হেসে সমরেশের পাশে বিছানার ওপর বসলো।

সমরেশ·· নন্দিতা তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে কি কথা বলতে গেলো; কিন্তু ভাষা না খুঁজে পেয়ে দৃষ্টি নামিয়ে চাদরের একটা খুঁট নিয়ে পাকাতে থাকে।

কি নন্দিতা? সমরেশ প্রশ্ন করে।

আমিতো এতদিন বেশ ছিলুম সমর! অনেক ভেবেছিলুম প্রথমে কিন্তু কোন কুল কিনারা খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে আপন মনে গুমরে কেঁদে মরেছি। তুমি দেখা দিয়েই তো আমার সহ্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিলে—আমার সাধনা ব্যর্থ হলো। মরতে বসেছিলুম আমি কিন্তু আবার বাঁচতে সাধ হলো। ভাবলুম, মরবোই বা কেন? আমি পাঁচজনের মত বেঁচে থাকতে চাই। তুমি আমাকে বাঁচাও সমর। নন্দিতা সমরেশের বুকের ওপর মুখ রেখে কাঁদতে লাগলো।

সমরেশ তাড়াতাড়ি নন্দিতাকে তুলে বসিয়ে বল্লে, ছিঃ! রাত দুপুরে কি পাগলামি সুরু করলে বলতো?

তুমিও ভাবছো আমি পাগল হয়ে গেছি—কিন্তু পাগল হয়ে গেলেও বরং বাঁচতুম। নারীত্বের দিক দিয়ে আমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে। জীবনের কোন আশাই আমার পূরলো না। না পেলাম কারুর সহানুভূতি, না পেলাম স্বামীর প্রেম ভালবাসা। সবাই আমায় প্রত্যাখ্যান করেছে। আমার দুঃখের কথা শুনে সবাই হেসে ওঠে। সত্যি কথা বললে সবাই ঘৃণায় যাবে

পিছিয়ে। কিন্তু সমর, তুমি যদি আমায় গ্রহণ করো, কোন দুঃখই আমার নেই—আমি হাসতে হাসতে কলঙ্কের বোঝা মাথায় করেই বেঁচে থাকবো।

কিন্তু তুমি ভুল করছো নন্দিতা। ভুলে যাচ্ছ যে তুমি বিবাহিতা।

তুমি কি বলতে চাও নারীর ঐ এক ফোঁটা সিঁদুর আর দাঁত ভাঙ্গা দুটো সংস্কৃত মন্ত্রই হচ্ছে জীবনের এক-মাত্র সম্বল। সেই নিয়েই তাকে দীর্ঘজীবন গুণে গুণে কাটিয়ে দিতে হবে, যদিও সে পুরুষের কাছ থেকে ঐ সিঁদুর ও মন্ত্রের কোন মর্য্যাদাই না পায়। মিলনের ডোরে যে হৃদয় দুটো বাঁধা, কোন অনাদি অনন্ত কাল ধরে, সেটাই হলো ফাঁকি আর ধার করা, অর্থ না বোঝা বিয়ের মন্ত্রই হলো সবচেয়ে বড়ো ?

যথার্থই তাই নন্দিতা; আমরা হিন্দু; বিয়ের মন্ত্রই আমাদের সংসার পথের একমাত্র পাথেয়। তাকে ভুলে গেলে চলবে না, আমাদের হিন্দুসমাজ তো সে শিক্ষা দেয় না।

সমাজ আমি মানি না। সমাজ, সংসার কিছুই আমি চাই না সমর; শুধু চাই তোমাকে। বলো তুমি আমাকে গ্রহণ করতে পারো কি-না? বলে নন্দিতা সমরেশের একখানা হাত চেপে ধরে।

হাতটা টেনে নিয়ে সমরেশ জবাব দেয়, অসম্ভব নন্দিতা—তা হতেই পারে না।

তাহলে তুমি আমায় ভালবাস না! অশ্রুভরে চোখদুটো তার ঝাপসা হয়ে আসে।

বাসতুম নন্দিতা, যথেষ্ট ভালবাসতুম। কিন্তু এখন আর নয়। তোমার বিয়ের পর থেকে আমি তা ভুলে যাবার চেষ্টা করছি। তাই আমি তোমার কাছ থেকে দূরে থাকতুম—কাছে আসতে সাহস করিনি। কেননা আমিও মানুষ—দুর্ব্বলতা আমারও আছে।

তাই বলি, কি দরকার আমাদের প্রাণের আগুণকে লোক দেখানো ভদ্রতা দিয়ে চেপে রাখতে। হৃদয়ের জ্বালা তাতে বাড়বে বৈ তো কমবে না। দুজনেই আমরা দুজনকে চিনি ভাল করে—ভালও বাসি উভয়ে উভয়কে। চল আমরা সমাজ, সংসার, বাড়ীঘর আত্মীয়-স্বজন—সব ছেড়ে চলে যাই দূরে, বহুদূরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। সেখানে আমরা স্বর্গ রচনা করে পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসে জীবনের বাকী দিনগুলো কাটিয়ে দেবো।

তা আর হবার উপায় নেই নন্দিতা। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সমরেশ বল্লে।

কেন হয় না?

সমাজ আমাদের ভালবাসাকে মেনে নেবে না—আমরা সমাজের চোখে হয়ে উঠবো অভিশাপ—সবাই আমাদের ঘৃণা করবে অন্তরের সঙ্গে।

কিন্তু তাতে আমাদের দুঃখ কি—আমরা তো পরস্পর

পরস্পরকে ঘৃণা করবো না। নারীর যা কাম্য, যা প্রাপ্য আমি তা পাইনি। আমি তা পেতে চাই—বলো তুমিও কি আমায় বিমুখ করবে-? নন্দিতা সমরেশের আরও কাছে এসে করুণ চোখে তাকালো তার দিকে।

তা কি করে হয়—তোমার স্বামী রয়েছেন!

ঐতো একটু আগেই বলেছি—শাস্ত্রমতে আমার বিয়ে হয়েছে, স্বামীও আছেন ; আর স্বামী যে অপদার্থ তাও আমি বলতে পারি না। স্ত্রী যা চায় স্বামীর কাছ থেকে, আমি তা পাইনি কোনদিন। তাঁকে আমি ভালবাসার জালে বাঁধতে গিয়েছিলুম কিন্তু তিনি গেছেন দূরে সরে। আমার চেয়ে তিনি ভালবাসেন তাঁর মোটা মোটা ডাক্তারি বই, যন্ত্রপাতি আর ওষুধপত্রের শিশি বোতলকে। কাজেই তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি শুধু আমি সম্বন্ধ বজায় রাখবার মত কয়েকটা মামুলি কথা, মুখস্থ করা খানিকটা আদর।

তুমি শিক্ষিতা বলে গর্ব্ব কর নন্দিতা। স্বামীকে নিজের করে নেবার ক্ষমতা যদি না থাকে, তবে তোমাকে মুর্খ ছাড়া আর কি বলতে পারি!

যে নিজের নয়, তাকে কেমন করে নিজের করে নেবো তাতো বুঝতে পারি না। হয়তো কখন বলেছি, আমি সিনেমা বা থিয়েটার দেখতে যাব—তিনি তার বই বা ওষুধপত্রের বাক্স থেকে মুখতুলে মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছেন, বেশতো মোটর আমি রেখেই যাব ; মাখন বা সমীর, যাকে হোক সঙ্গে নিলেই

তো চলবে। আমি বলেছি, তুমি চলনা কেন আমার সঙ্গে। তিনি বলেছেন, ওরে বাপ আমার কত কাজ—হাতে কয়েকটা সাংঘাতিক রোগী! অনেক রাত্রি অবধি জেগে তিনি রোজই পড়াশুনা করেন। আমি হয়তো এক একদিন বলেছি, শুয়ে পড়ো অসুখ করবে যে। তিনি বই এর পাতা থেকে চোখ না তুলেই উত্তর দিয়েছেন, হ্যাঁ এই যে শুই। আমি পড়েছি ঘুমিয়ে; খানিক রাতে ঘুম ভেঙ্গে যেতে দেখি—তখনও ঘরে আলো জ্বলছে—নিবিষ্ট মনে তিনি বই পড়ছেন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সমরেশ বল্লে, সবই বুঝলুম নন্দিতা। কিন্তু প্রকাশ যে এতবড় খামখেয়ালি, এত বড় দায়িত্বজ্ঞানহীন আমি তো আগে ভাবিনি।

এখন বুঝলে তো শুধু তোমার একটা ভুলে কি করে আমার জীবনের সমস্ত আশা, ভরসা, আনন্দ শেষ হয়ে যেতে বসেছে। তাঁর কাছ থেকে আমি চলে এসেছি, আজ প্রায় দেড় বছর হলো। আর আমি সেখানে যাইনি—তিনিও আসেন নি এখানে একবারও। মাঝে মাঝে তাঁর এক এক খানা চিঠি পাই, হ্যাঁ উত্তরও আমি দিই যথাসময়ে। সে চিঠি পড়ে কেউ বুঝতে পারবে না, স্বামী স্ত্রীর চিঠি বলে। মনে হবে, কোন বন্ধু তার পুরোণো বান্ধবীকে লিখেছে, সে কেমন আছে জানবার জন্যে।

ঢং ঢং করে ঘড়িতে ছুটো বেজে উঠতেই সমরেশ

তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, না, না নন্দিতা—তুমি এবার শোওগে যাও।

কেন আমি এসেছি বলে তোমার ভয় করছে ?

ভয় ! না, তা ঠিক নয় ; তবে কি জান……

থামলে কেন ? বলতে চাও লোক নিন্দা ; কেউ যদি জানতে পারে, কি ভাববে—এই না ! লোকে সত্যিই যদি টের পায়, অপবাদটা তোমার চেয়ে আমারই হবে বেশী। আমি যদি সেই কলঙ্কের বোঝা মাথায় করে বেঁচে থাকতে পারি, তুমি পারবে না ?

না। কথাটা সহসা সমরেশের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে।

পুরুষ জাতি এমনি স্বার্থপর !

তোমার মাথার ঠিক নেই ; তুমি এখন এ প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে শোওগে যাও, লক্ষ্মীটী। এই বলে সমরেশ তাকে একরকম জোর করেই হাত ধরে টেনে তোলে।

সে কি বুঝলো বলা যায় না। কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চল-ভাবে সমরেশের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর আর কোন কথা না বলে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে গিয়ে দরজাটাকে ভেজিয়ে দিলো। সমরেশ উঠে সেটাকে ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে ক্লান্ত দেহটাকে বিছানার ওপর এলিয়ে দেয়। তখনও তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে—কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

আট

বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোনো সমরেশের কোন কালেই অভ্যেস নেই ; শুধু আজই তার ব্যতিক্রম হয়েছে। যখন তার ঘুম ভাঙ্গলো, আটটা বেজে গেছে—পূর্বদিনের ট্রেণে আসা যে তার কারণ, তা ঠিক নয়। প্রধান কারণ—গত রাত্রিটা তার কেটেছে অনিদ্রা, দুঃশ্চিন্তা আর নানান দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। অনেকবারই তার মনে দুরাশা জেগেছিল, নন্দিতাকে জীবনের সাথী করে নিভৃত নিরালায় মহাশান্তিতে জীবনটাকে উপভোগ করে কাটিয়ে দিতে। এই নিয়ে অনেক কল্পনা, দুরভিসন্ধি সে করেছে। সে উঠেছে, বসেছে, অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভেবেছে—ফলে রাত এলো ফুরিয়ে। ভোরের হাওয়া লাগলো এসে তার গায়ে ; দূরে দু'একটা কাক উঠলো ডেকে! হঠাৎ অতর্কিতে তার চোখের পাতা দুটো আসে বুজে। সকালের কড়া রোদ চোখে এসে পড়তেই, তার খেয়াল হলো বেলা অনেক হয়েছে। ধড়মড়িয়ে সে বিছানার ওপর উঠে বসলো। ভাল করে তাকাতেই বিছানার ওপর নন্দিতার মাথার একটা কাঁটা পড়ে আছে, দেখতে পায়—বোধ হয় তার মাথা থেকে কাল রাতে খুলে পড়েছে। সে সেটাকে হাতে নিয়ে বার কয়েক নাড়াচাড়া করলো, তারপর বালিশের তলায় রেখে দেয়। গতরাত্রের ঘটনা-

গুলি পর পর তার মনের ওপর ছায়া ফেলে গেলো। সে শিউরে উঠলো হঠাৎ, আর ঠিক সেই সময় নন্দিতা এসে ঘরে ঢুকলো।

পরণে তার শান্তিপুরী তাঁতের কাল শাড়ী। পিঠের ওপর আলুলায়িত কুন্তলদাম, মুখে সলজ্জ হাসি। জানালা দিয়ে খানিকটা রোদ এসে তার মুখের ওপর পড়েছে। সমরেশ তার মুখের দিকে ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে তাকিয়ে থাকে, নন্দিতাও প্রখর কৃষ্ণ চোখ নিয়ে চেয়ে আছে তারই দিকে। একটু পরেই সমরেশ দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। নন্দিতা জিজ্ঞেস করে, কি তুমি বুঝি এই উঠছো ? খুব ঘুম যা' হোক।

সমরেশ এর কি আর উত্তর দেবে ! শুধু বল্লে, হু।

' এসো চা দেওয়া হয়েছে—বাবা তোমার জন্মে নীচে অপেক্ষা করছেন।

হ্যাঁ চলো যাই।

নন্দিতার কিন্তু যাবার ইচ্ছে দেখা গেল না। সমরেশের বিছানাটা গোছ করতে করতে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, আমার আচরণে তুমি বুঝি খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছো, না ?

হ্যাঁ তাতো হবারই কথা !

কিন্তু তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। যা নিছক সত্যি, তাইতো আমি বলেছি ; মিথ্যা ভালবাসার ভান করে লোককে ফাঁকি দেওয়া চলে কিন্তু নিজের মনকে তো কিছুতেই বুঝিয়ে ওঠা যায় না। সেখানে আত্মার

না আছে শান্তি, না আছে পরিতৃপ্তি। সত্য যা, তা চিরকালই রুঢ়। আমি তো জানি যা সত্য, সেটা প্রকাশ করাই ভাল। পাপপুণ্য অত বোঝাবুঝির ধারে আমি নেই।

তুমি আবার ছেলে মানুষী আরম্ভ করলে!

ছেলে মানুষী বলে এটাকে হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না সমর। নিজের বুকে হাত দিয়ে তুমি বলো দেখি, এখনও তুমি আমাকে ভালবাস কি না?

বাসি নন্দিতা। মাঝে মাঝে তোমার কথা স্মরণ করে সত্যিই আমি চঞ্চল হয়ে পড়ি; শুধু এই বলেই মনকে প্রবোধ দি যে তুমি বিবাহিতা; কাজেই তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্বন্ধ নেই, আর থাকাও উচিত নয়।

নন্দিতা আবার হাসে; বলে বিবাহ তো আমাদের অতি আদিম এক সামাজিক গণ্ডি মাত্র। মানুষকে ভয় দেখিয়ে সংসারে বেঁধে রাখবার একটা কৌশল। যেখানে কোন আনন্দ নেই, যে বিয়েতে শান্তির চেয়ে অশান্তিই বেশী—তুমি কি বলো সে বিবাহ-বন্ধন আমাদের মেনে চলতে হবে?

হবে বৈ কি নন্দিতা।

সে বাঁধন ছেঁড়বার কোন উপায় নেই।

না; আবার তুমি বড় বড় কথা পাড়লে এই সকালে। এই না বল্লে, বাবা অপেক্ষা করছেন?

ও হ্যাঁ, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নন্দিতা বল্লে, তারপর সে ঘুরে বাইরের দিকে এগিয়ে বল্লে, আর দেরী কোরো না।

সমরেশও তার সঙ্গে গেলো।

নয়

থাকুন না কেন সমস্ত ছুটীটা এখানে সমরেশবাবু, টেবিলের ওপরে গোছান বইগুলো আবার গোছাতে গোঁছাতে নমিতা বল্লে।

সমরেশ সামনের খোলা মাঠের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলো, ছুটীতো মোটে দু'মাস; তার মধ্যে পনেরো দিন কাটিয়ে এসেছি বাড়ীতে আর এখানে আজ নিয়ে ষোলো দিন কাটলো। বাকী আছে মাত্র এক মাস—পিসিমার ওখানে একবার দেখা করে যাব ভেবেছিলুম।

সে না হয় আর একসময় এসে দেখা করবেন। আপনার সঙ্গে এখনও তো আমার ভাল করে পরিচয়ই হয় নি। তা'ছাড়া নন্দিতাদি কখনও আপনাকে তাড়াতাড়ি যেতে দেবে না—এ আমি জোর করে বলতে পারি।

নন্দিতা কি সত্যই আপনার দিদি হন মিস ব্যানার্জ্জি?

বাঃ এখবরটুকুও আপনি আজও শোনেন নি? উনি আমার মাসতুতো বোন; আপনাদের সঙ্গেই তো এক-সঙ্গে পড়েছি, তবে এক কলেজে নয়—আমি পড়তুম বেথুনে। দেখাশুনা আপনার সঙ্গে হয়েছে অনেকবার, কথাও কয়েছি কয়েকবার। আপনাকে প্রথমদিন দেখেই আমি চিনতে পেরেছি কিন্তু আপনি সেদিন আমার সঙ্গে নিতান্ত অপরিচিতের মত কথা কইলেন!

সত্যই আমি মোটে চিনতে পারিনি আপনাকে। সব জিনিষ আমি মনে রাখতে পারি না, কেন বলুন তো?

একটু হেসে নমিতা বল্লে, কেন তা আমি কি করে বলবো! তবে সব কথা ভোলা ভাল নয়, এটুকু আপনাকে বলে রাখি। আপনারা তো মেয়েদের সঙ্গে এক কলেজে পড়েছেন। আপনার মতে কো-এডুকেশন কি আমাদের দেশে চলতে পারে?

কেন পারবে না মিস ব্যানার্জ্জি! ছেলেমেয়েরা এক-সঙ্গে থাকলে বা একসঙ্গে পড়াশুনা করলে, তাদের মধ্যে লজ্জাজনক যে একটা আড়াআড়ি রয়েছে, সেটা অচীরে দূর হয়ে যাবে। ফলে তাদের মনে উদয় হবে এক নতুন বন্ধু প্রীতি। তবে অনেকে এই সুযোগটুকু গ্রহণ করে নানা রকম রঙ্গীন কাহিনী গড়ে তোলে। সমাজে একদল লোক আছে, যারা মানুষের দুর্ব্বলতাটুকু

নিয়েই উপহাস করে—তাতেই তাদের আনন্দ সব চেয়ে বেশী। লোকের ভালটুকু গ্রহণ করতে পারি না বলেই তো সমাজ আজ আমাদের এত পিছনে পড়ে রয়েছে।

কো-এডুকেশন ভাল, আপনি বল্‌ছেন?

সমরেশ বল্লে, আপনিই বা খারাপ বলতে পারেন কোন হিসেবে?

না তা ঠিক বলছি না। তবে অনেক ছেলেমেয়ে এই অবাধ মেলামেশার সুযোগ লাভ করে তাদের জীবন-গুলোকে বিষিয়ে তোলে।

সংখ্যার দিক দিয়ে দেখলে তারা খুবই নগণ্য। আর একটা কথা, যে জাতিরা আজ পৃথিবীতে সভ্য বলে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, তারা স্ত্রীপুরুষের মেলামেশা নিয়ে আমাদের মত এভাবে মাথা ঘামায় না। সত্যিই যদি কোন ছেলে কোন মেয়েকে ভালবাসে, তাতে তো কোন দোষ দেখি না; কেন না, ভালবাসা মানুষের চিরন্তন ধর্ম্ম—ওটাকে বাদ দিলে তো সমাজ চলে না।

মাফ করবেন সমরেশবাবু—আমি দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রে তারা এই অবাধ মেলামেশার ফলে সমাজের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে, সংসারে গুরুজনদিগকে অমান্য করে, সামান্য মোহের বশবর্ত্তী হয়ে, এমনই ব্যবহার করে, যা মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

সেই জন্যেই তো শিক্ষিত সমাজের দায়িত্ব তাদের মানুষ

করে তোলা। চোখের সামনে আদর্শ খাড়া করে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার—তারা যে পথে চলছে, সে পথে তাদের জীবনের মুক্তি মিলবে না। আঘাত আমাদের প্রথমে কয়েক ঘা খেতেই হবে। যা এ-আবহাওয়ায় কোনদিন চলেনি, সেটাকে চালাতে হলে বিরুদ্ধ মতামত অনেক কিছু উঠবে জানি। কিন্তু সেগুলোকে সযত্নে সমাধান করে, তার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বিরুদ্ধাচরণকারীদের মুখ বন্ধ করতে হবে। তবেই তো দেশের শান্তি, সেখানেই শোনা যাবে ঐক্যের মন্ত্র। সমাজের ঘুণধরা পুরোণো খুঁটিগুলোকে সকলে মিলে সবলে আঁকড়ে ধরে রাখলে, সমাজকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবো না। আমাদের কাজ, সেই ঘুণধরা খুঁটি-গুলোকে আস্তে আস্তে বদলে নতুন খুঁটি লাগিয়ে সমাজে নতুনের ধারা আনা—সমাজকে সহজভাবে বাঁচবার সুযোগ দেওয়া।

শুধু দেশে কো-এডুকেশন প্রচলন করে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়াশুনা করবার সুযোগ দিলে দেশের যথার্থ মুক্তি দেখা দেয় না ; তার সঙ্গে চাই ছেলে মেয়ে উভয়কে সমাজের প্রতিটি কাজে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাজ করবার সুযোগ দেওয়া।

সমরেশ নমিতার কথা সমর্থন করে বল্লে, ঠিকই তাই ; দেশের ভালমন্দের জন্য পুরুষ এবং নারী সমভাবে দায়ী। কিন্তু এমনি মনোভাব আমাদের দেশের যে ছেলেমেয়ে একত্র

কথা কইলে বা গল্প করলে একটা বিশ্রী ধারণা করতেই হবে।

আচ্ছা তার জন্যে আপনি কাকে বেশী দায়ী করেন সমরেশবাবু।

দায়ী করতে হলে ছেলে এবং মেয়ে তুজনকেই দায়ী করতে হয় একসঙ্গে। কেন না, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ব্যবধান রচনা করেছে তারা নিজেরাই, কাজেই সে ব্যবধানও তাদের মিলিত চেষ্টায় দূর করাও সম্ভবপর। বাসে বা ট্রামে পুরুষের ভীড়ের মধ্যে চলাফেরা করতে আমাদের দেশে আধুনিকাদের অসুবিধা হয় না কিছু, তাতে তাদের সম্মানে ঘা লাগে না একটুও। তাদের মর্য্যাদাহানি হয় তখনই, যদি কোন মুহূর্ত্তে অতর্কিতে গায়ে কোনরকমে পুরুষের হাত ঠেকে যায় বা কোন যুবক পাশে গিয়ে ভুলক্রমে বসে পড়ে। তারপর হয় নাটকীয় ভঙ্গিতে এর পরিসমাপ্তি।

এমন সময় নমিতার দাদা বিজন এসে ঘরে ঢুকলো। সমরেশের দিকে তাকিয়ে সে বল্লে, আরে সমর বাবু যে—কতক্ষণ এসেছো ?

এই ঘণ্টাখানেক হবে।

খবর ভাল সব ?

হ্যাঁ একরকম ভাল, তারপর তুমি আছ কেমন, করছো কি ?

কণ্টাকটারী।

শেষে অমন চাকরীটা ছেড়ে দিলে, সমরেশ একটু দুঃখের সঙ্গে বল্লে।

কি আর করি ভাই। আপিসের সাহেব সুবার সঙ্গে আমার একেবারেই বনতো না—ঝগড়া বাঁধতো প্রায়ই। ভেবে দেখলুম, মেজাজ আমার ভাল নয়—কোন দিন কি হতে কি হয়; হয়তো খুনোখুনি হয়ে যাবে শেষ পর্য্যন্ত; কাজেই চাকরী ছাড়তেই হলো। আনন্দবাবু মতলব দিলেন ব্যবসা করতে—লেগে গেলুম তাঁর কথামত। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী বলে যে প্রবাদ আছে—কথাটা একেবারে খাঁটী সত্যি। যত খাটবে ততই পয়সা ভাই ব্যবসাতে। যাকগে ওকথা তুমি এখানে আছ কতদিন?

সমরেশ নমিতার দিকে একবার তাকিয়ে উত্তর দিলো; যাব তো ঠিক করেছিলুম তাড়াতাড়ি কিন্তু নন্দিতা ও নমিতা যে ভাবে পীড়াপীড়ি সুরু করেছে, দেখছি পুরো ছুটিটাই না এখানে কাটাতে হয়।

অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা, না হয় থেকেই গেলে কয়েকদিন। তারপর বিজন নমিতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কিরে নমিতা, চা পর্ব্ব বোধকরি তোদের আমি আসার আগেই শেষ হয়ে গেছে।

নমিতা এতক্ষণে আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুণী দিয়ে মাথার সামনে যে কয়টা চুল বারবার মুখের ওপর এসে পড়ছিলো, সেগুলোকে ঠিক করতে ব্যস্ত। কাজেই

ছোট্ট একটা হু দিয়ে দাদার কথার উত্তর শেষ করে।

বিজন বল্লে, আমার একটু দেরী হয়ে গেলো। কিন্তু চা আর এক কাপ না হলেও তো চলছে না। যা বোন, একটু কষ্ট কর। সমরবাবুর জন্যেও আনিস আর এক কাপ।

সমরেশ তাড়াতাড়ি বল্লে, না, না আমার জন্যে আনতে হবে না, নমিতা দেবী। আমি চা বেশী খাই না।

নমিতা বল্লে, অনুরোধেও তো মানুষ অনেক ত্যাগ স্বীকার করে; আপনি না হয় এক কাপ চাই খেলেন।

হাতের চিরুণীটা ড্রেসিং টেবিলে রেখে একবার দাদা তারপর সমরেশের দিকে তাকিয়ে বল্লে, বসো তোমরা, আমি এক্ষুণি চা তৈরি করে আনছি।

দশ

বল্লুম আমি অতো লেখাপড়া জানা মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবো না, তা তখন আমার কথা কেউ কানেই তুললো না; এখন হলো তো হাতে নাতে তার ফল পাওয়া গেল তো!

প্রকাশ তখন ইজিচেয়ারে শুয়ে একখানা ইংরাজি উপন্যা-সের পাতা উল্টিয়ে চলেছে। সেদিন সকাল থেকে শরীরটা

তার ভাল নয় ; কাজেই ডাক্তারখানায় যায়নি বা কোন রোগী দেখতে বের হয় নি। অবসাদগ্রস্থ মনকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্যে সন্ধ্যে বেলায় উপন্যাসে মন দিয়েছে। বইখানি লাগছিলো মন্দ না। মা যে কখন ঘরে ঢুকেছেন সেদিকে তার খেয়াল ছিল না ; তাঁর বকাবকি শুনে সে বই থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করে, কি বলছো মা, কে কি করেছে ?

কে আবার—আমাদের বৌমা।

প্রকাশ আশ্চর্য্য হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে, বৌমা !

হ্যাঁ গো হ্যাঁ ; আমাদের গুণের নন্দিতা দেবী।

কেন সে এসেছে নাকি ?

আসতে তার দায় পড়েছে—বড়লোকের মেয়ে, দেমাকেই মলো। দেখা যাক্ বাপ কতদিন ঐ বিয়েওয়ালা ধিঙ্গি মেয়েকে ঘরে পোষেন। হতো আমার নিজের মেয়ে, গলা টিপে আমি মেরে ফেলতুম, লোকের কথা শোনবার অনেক আগে।

প্রকাশ ব্যস্ত হয়ে বল্লে, কেন মা সন্ধ্যেবেলায় মিছেমিছি পরের মেয়েকে গালমন্দ দিচ্ছো।

তুই বলিস কি প্রকাশ—মিছেমিছি আমি বকছি !

আচ্ছা না হয়, সত্যি কথাই বলছো। কিন্তু কি লাভ বলতে পার মাথাগরম করবার ? সে তো আর এখানে বসে নেই, তোমার কথা শোনবার জন্যে।

তাইতো বলছি, চিরকালই কি আমি তোদের সংসারের বোঝা বইবো ? বিয়ে থা দিলুম কোথায় বৌ এসে সব বুঝে পড়ে নেবে। কিন্তু হায়রে আমার পোড়া কপাল—বৌয়ের হাতের রান্না খেতে হলো না একদিনও।

ভেবে কি আর করবে বলো মা ; ভগবান অদৃষ্টে যার যা লিখেছেন, কি করে খণ্ডাবে বলো ? বলে প্রকাশ আবার বইএর পাতায় মন দেবার চেষ্টা করলো।

দেখ্ বাপু, আমার কথা শোন্—যা হবার তাতো হয়েছে। এখন দেখে শুনে তুই আর একটা বিয়ে কর, যাতে সংসার বজায় থাকে। ঘাড় ফিরিয়ে প্রকাশ জিজ্ঞেস করলে, কি বললে মা, আবার আমি বিয়ে করবো ?

হ্যাঁ তাতে হয়েছে কি ?

প্রথম বৌ থাকতে ?

তার সঙ্গে যখন তোর বনিবনা নেই, সেও যখন এখানে থাকতে চায় না, সুতরাং তার সঙ্গে আর আমাদের সম্বন্ধ রেখে লাভ কি আছে বলতে পারিস ?

প্রকাশের এসব কথা শোনা আজ নতুন নয়—সে শুনেছে এর আগে অনেকবার কিন্তু জবাব সে দেয়নি কখনও। নির্ব্বিবাদে চুপ করে সমস্ত শুনে গেছে। কিন্তু আজ তার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গলো। সে হাতের বইটা রাগ করে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লে, তোমরাই বা তার কত খোঁজ নিয়েছো আজ পর্য্যন্ত—কতবারই বা তাকে

আনবার জন্যে লোক পাঠিয়েছো ? ভুল সে হয়তো করেছে এবং সে ভুল বোঝবার ক্ষমতা এখনও তার হয়নি। তবে জোর করে আমি একথা বলতে পারি যে তার ভুল একদিন ভাঙ্গবেই এবং তাকে আসতে হবে আবার এই বাড়ীতে। যতদিন না তার সে ভুল ভাঙ্গে, ততদিন আমাকে অপেক্ষা করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথই আমি দেখতে পাচ্ছি না।

তোমরা সব আজকালকার ছেলেমেয়ে—যা ভাল বোঝ করো ; এতে আমার বলবার নেই কিছু। তোমাদের মাঝে থেকে দুটো কথা বলে, আমার অপমান কুড়োবারই বা দরকার কি ? এই বলে তিনি যে ভাবে ঘরে ঢুকেছিলেন, ঠিক সেইভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মা চলে যেতে প্রকাশ হাত দুটো ভাঁজ করে পেছনে ইজিচেয়ারের ওপর রাখলো ; তার ওপর মাথাটা রেখে চোখ বুজলো। খানিকপরে সে দেখলো—নন্দিতা সেজেগুজে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে এলো—নতজানু হয়ে নমস্কার করে তার পায়ের ধুলো নিলো।

প্রকাশ জিজ্ঞেস করলে, তাহলে সত্যিই তুমি চল্লে ?

কি করবো বলো—বাবাও এসেছেন নিতে ; মনটাও ভাল নয়। দিনকতক সেখানে গিয়ে থাকি, যদি মনটাকে কিছু শান্ত করতে পারি !

প্রকাশ তার হাতটা চেপে ধরে বল্লে, একটা কথা তুমি

বলে যাও নন্দিতা, যে তুমি আমার ওপর রাগ করে চলে যাচ্ছ না ?

নন্দিতা তার দিকে অশ্রুসজল চোখ দুটো তুলে বল্লে, রাগ করবো কেন, বলোতো ?

আমার শুধু মনে হয়, যে তাড়াতাড়ি তোমাকে বিয়ে করে আমি ভাল করিনি। ভাল তোমাকে বাসতে চেষ্টা করেছি কিন্তু কি জানি কেন আমি মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে পড়েছি। কি বলতে কি হয়তো বলে ফেলেছি—তুমি কত ব্যথা পেয়েছো।

তুমি ডাক্তার; তোমার কাছে ডাক্তারি বই, যন্ত্রপাতি ওষুধপত্র, রোগীর সেবাশুশ্রূষা অনেক বেশী দামী। আর আমি সামান্য নারী—আমার প্রেমে বন্দী হয়ে তোমার মহৎ আদর্শকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

তবুও স্ত্রী তুমি—তোমাকে সুখে রাখা আমার কর্ত্তব্য।

মুখে জোর করে হাসির রেখা টেনে নন্দিতা বল্লে, আমিতো তোমাদের সংসারে কোনদিনই অসুখী ছিলাম না। কাপড় জামা চাইবার আগেই রাশিকৃত দেখি জড় হয়েছে। নতুন ফ্যাসানের গয়নাগাটীর তো কোনটারই আমার অভাব নেই। রূপচর্চ্চার যাবতীয় জিনিস আমার যা আছে, দশজনকে বিলিয়ে ও ব্যবহার করে শেষ করতে পারবো না। সত্যি বলাছি, আমার সখ সৌখিনতা বজায় রাখবার জন্যে যেখানে যা প্রয়োজন, তোমার কাছ থেকে তা পেয়েছি

অনেক বেশী রকমেরই। শুধু পাইনি তোমার কাছ থেকে ভালবাসা।

ঢং ঢং করে ঘড়িতে নয়টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের চমক ভাঙ্গে। সে ঘরের চারিধারে একবার ভালকরে চোখ বুলিয়ে নিতে দেখে নিতাই দাঁড়িয়ে। সে জিজ্ঞেস করলে, দাদাবাবু, আপনি এখুনি খাবেন, না, একটু দেরী আছে?

একটা আড়মোড়া ভেঙ্গে প্রকাশ বল্লে, দেরী করে আর কি হবে? তুই খাবার দেবার যোগাড় কর—আমি যাচ্ছি।

এগারো

আচ্ছা অনিতা, তুমি যে রোজ এমনি করে সন্ধ্যে-বেলা এখানে আস, মা সে কথা জানেন তো? গায়ের কোটটা খুলতে খুলতে প্রকাশ জিজ্ঞেস করলে।

হাতের কাছে জানালার পর্দাটা টেনে দিয়ে সে উত্তর দিলো, হ্যাঁ।

তিনি তোমার আসা যাওয়া নিয়ে কিছু বলেন নি কোনদিন?

অনিতা প্রকাশের দিকে তাকিয়ে বল্লে, না, কিছু না।

কিন্তু হঠাৎ এসব কথা জিজ্ঞেস করছো কেন, বুঝতে পারছি না।

প্রকাশ তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নেকটাই খুলছে। সে বাইরে গেছলো রুগী দেখতে; এসে দেখে অনিতা তার টেবিলের ওপর বই, কাগজ, পত্র সব গোছ করতে ব্যস্ত। অনিতাকে সে এভাবে বহুদিন দেখেছে—কোনদিন কোন প্রশ্নই তাকে করেনি। কখনও বা প্রকাশ তার কাজ করা নীরবে তাকিয়ে দেখেছে। অনিতা তা দেখে হাসতে হাসতে বলেছে, হেলাগোছা আমি একেবারে দেখতে পারি না। বাড়ীতে বাপমার সঙ্গে এই নিয়ে মাঝেমাঝে বিষম তর্ক হয়। আপনার ঘরে যখনই ঢুকি, দেখি, সব কিছুই ওলট পালট হয়ে আছে—কাজেই আমাকে হাত দিতেই হয়।

প্রকাশ বললে, কিন্তু এসবের কি দরকার বলতে পার? আমার তো বেশ চলে যায়—কোন অসুবিধাই হয় না কখনও।

চলে গেলেও এভাবে চলা উচিৎ নয়। লোকে ঘরে ঢুকলে কি ভাববে বলুন তো! ভাববে, লোকটা ডাক্তার কিন্তু এত অন্যমনস্ক।

এইভাবে তাদের পরিচয়। অনিতা তাদের পাশের বাড়ীতেই থাকে। বাবা তার কোন সরকারী আফিসে চাকরী করেন। মেয়েটাকে তিনি আই, এ পর্য্যন্ত পড়িয়ে-

ছেন। কাজেই সে যে শিক্ষিতা আর সেই সঙ্গে স্মার্ট (সপ্রতিভ) সেটা ধরে নিতেই হবে। নন্দিতা চলে যাবার কয়েকমাস পর থেকেই অনিতা এ বাড়ীতে আসা যাওয়া সুরু করেছে। প্রকাশ চিরকালই আত্মভোলা লোক—অত বোঝাবুঝিতে সে যায় না। কাজে কাজেই অনিতা আসে, কথা কয়, গল্প করে, মাঝে মাঝে তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসে—প্রকাশ সে সব নিয়ে মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করে না। হঠাৎ কেমন একটা কথা তার কাণে গিয়ে পৌঁছিয়েছে, আর প্রকাশেরও মনে হয়েছে কথাটা একবার অনিতার কাছ থেকে জেনে নেওয়াই ভাল। তবুও সোজাসুজি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করা যায় না—হয়তো সে মনে কিছু করতে পারে! তাই ঘুরিয়ে আসল কথাটাই অনিতার মুখ থেকে শুনতে চায় প্রকাশ। আয়নার দিকেই মুখ রেখে প্রকাশ জিজ্ঞেস করলে আচ্ছা, মাকে দেখেছো? তিনি নীচে আছেন নাকি?

মাসীমা কোথায় যে বেরুলেন এইমাত্র। বললেন, তুমি বোসো—আমি এখুনি আসছি।

মায়েরই বা কেমন আক্কেল বলো তো—তোমাকে একেলা রেখে চলে গেলেন।

একেলা আর থাকতে আমায় হলো কৈ! আমি জানি যে তুমি এখুনি আসবে।

প্রকাশ সামনের একখানা চেয়ারের ওপর বসে বল্লে,

এভাবে একেলা সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে এক ঘরে বসে গল্প করতে, তোমার ভয় করে না, অনিতা ?

অনিতা মাটীর দিকে মুখ নত করে বল্লে, কেন কিসের ভয় ?

দেখো, আমি পুরুষ আর তুমি নারী। তোমাকে এত কাছে পেয়ে ধরো, যদি কোনো অসতর্ক মূহূর্ত্তে কিছু অন্যায় করে ফেলি····· ······

অনিতা জানালার বাইরে চেয়ে উত্তর দেয়, এমন কিছু তুমি করতে পারো না, যার জন্যে আমার মাথা হেঁট হতে পারে।

ধরো, সত্যিই যদি কিছু ঘটে, যাতে তোমার নারীত্বের অবমাননা হয়।

অনিতা বল্লে, এখনও তুমি আমায় বুঝতে পারলে না—যে জাগ্রতে, নিদ্রায়, স্বপ্নে শুধু তোমারই মূরতি ধ্যান করছে, তাকে আজও চিনতে পারলে না! অন্তর যাকে বিলিয়ে দিয়েছি অনেক দিন আগেই, তাকে তো অদেয় কিছু থাকতে পারে না। সে যদি আমার কাছে কোন একটা অসম্ভব জিনিষই দাবী করে, তাকে তো বিমুখ করতে পারবো না।

প্রকাশ ভাবে মেয়েরা বড় অসহায়, ভয়ানক সেন্টি-মেন্টাল—সহজেই পুরুষের প্রেমে পড়ে যায়। তারপর দু'দিন পরে হয়তো তারা ভুল বুঝতে পেরে দূরে সরে

যায়। নিজেরা ও তারা কাঁদে আর সেই সঙ্গে কাঁদিয়ে মারে পুরুষকে। তাই তার মেয়েদের ওপর কোন স্নেহ নেই। টেবিলের ওপর ছোট্ট একটা ঘুসি মেরে প্রকাশ জিজ্ঞেস করে, সত্যি, তুমি আমায় ভালবাস, অনিতা ?

আবেগ ভরে প্রকাশের একখানা হাত ধরে অনিতা বল্লে, সে কথা তুমি এতদিন পরে বুঝলে !

বিদ্যুতের মত তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নিয়ে প্রকাশ চীৎকার করে বলে উঠে, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না ; তোমাকে কেন, কোন মেয়েকেই না। বিশ্বাস করতুম আগে খুব, বোধ হয় কেউ তা কখনও করতে পারে না। কিন্তু দেখেছি, তোমরা সবাই স্বার্থপর—প্রেম, প্রণয় শুধু তোমাদের কাছে অভিনয়।

অনিতা বহু চেষ্টা করে এতক্ষণ চোখের জল ধরে রেখে-ছিলো—এখন তা গণ্ড বেয়ে বর্ষার ধারার মত মাটীতে পড়তে লাগলো ; কাঁদতে কাঁদতে সে বল্লে, তুমি ভুল বুঝছো প্রকাশ-দা।

হো হো করে হেসে প্রকাশ বল্লে, দাদা। ও তোমাদের মামুলি কথা। প্রথমে বলো দাদা ; কিছুদিন পরে প্রেম নিবেদন করো। তারপর ঘটনাচক্রে হয়তো দেখা দিলো ব্যবধানের সেতু—তোমরা অতীতের সমস্ত স্মৃতি ভুলে গিয়ে পরের সংসারে গৃহলক্ষ্মী হয়ে বসো। তারও অনেক পরে তোমরাই হয়ে ওঠো সন্তানের জননী। পুরোণো দিনের কথা

মনে করতেই তোমাদের লজ্জা হয়—সব কিছুই তখন মনে হয় ছেলেখেলা।

কথা কইবার মত অনিতার আর শক্তি নেই। সে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। প্রকাশ ডাকে, অনিতা। অনিতা ঘাড় ফেরায়।

প্রকাশ বল্লে, অন্যায় যদি কিছু তোমায় আমি বলে থাকি, তুমি আমায় ক্ষমা কোরো। ভবিষ্যতে যে দিন তুমি তোমার নিজস্ব দাবী জানিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে, আমি চেষ্টা করবো সে দাবী পূর্ণ করতে।

অনিতা তখন নিশ্চল পাষাণের মত দাঁড়িয়ে থাকে দরজার সামনে। প্রকাশ এবার শান্তকণ্ঠে বল্লে, তুমি যেতে পার এখন; তবে যে কথাগুলো আমি বল্লুম, একটু ভেবে দেখো।

এই সময়ে প্রকাশের মা ওপরে এসেছেন। শেষের কয়েকটা কথা শুনে তিনি এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করেন, কি কথারে প্রকাশ?

অনিতা ততক্ষণ সিঁড়িতে নেমেছে। মায়ের কথার উত্তরে প্রকাশ অনিতাকে দেখিয়ে বল্লে, ওকে জিজ্ঞেস করো। তারপর সে ওপাশের দরজাটা দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলো।

প্রকাশের মা অনিতাকে লক্ষ্য করে বল্লেন, অনি, দাঁড়া মা।

অনিতা ক্ষণেক দাঁড়ায়। তিনি তার পিঠে সস্নেহ হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করেন, কি হয়েছে, কাঁদছিস্ কেন?

ও কিছু নয়, বলেই সে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নীচে। প্রকাশের মা একবার শূন্য ঘরটার দিকে, তারপর অনিতার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, হোল কি তোদের!

বারো

এলাহাবাদে সমরেশ ছিল ভালই কলেজে অধ্যাপনা নিয়ে। সেখানে জুটতো এসে ছেলের দল। কেউ আসতো পড়াশুনা করতে, কেউবা আসতো সভাসমিতি, ফুটবল, ব্যাটবল, হকি, সাঁতার, জিমনাসিয়াম—একটা না একটা কিছুর খবর নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে ও উপদেশ নেবার জন্যে। কলেজের ছাত্রদের সমরেশবাবুকে না হলেই চলে না। সব কাজেতেই তাঁর সাহচর্য্য তাদের চাইই। সমরেশ ও তাদের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দের সঙ্গে কাটিয়ে দিতো দিনগুলোকে। সমরেশ ভাবে সত্যই সে নন্দিতার ওপর অবিচার করেছে—তার সরল বিশ্বাস ও অকৃত্রিম ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করেছে নিলর্জ্জের মত। জীবনটাকে সত্যই তার ব্যর্থ করে দিয়েছে।

সেদিন বিকেল থেকেই আকাশে মেঘ জমতে সুরু করেছে। দিনের আলো তখনও রয়েছে—তবুও চারিধারে দেখা দিয়েছে সন্ধ্যার কালোছায়া। ঝির ঝির করে ঠাণ্ডা

হাওয়া বইছে—বোধ হয় এখুনি বৃষ্টি নাম্‌বে। সমরেশ জানালার সামনে ইজিচেয়ারে শুয়ে ভাবছে অনেক কথা; অনেক অসম্ভব কথাই তার মনে হচ্ছে। আজ তার মনে হয়, সত্যিই সে নন্দিতাকে ভালবেসেছিলো আর নন্দিতাও হয়তো তাকে ভালবাসতো, অন্ততঃ দেখে তাইতো মনে হোতো। যোগেনবাবু নন্দিতার বিয়ের জন্যে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কাজেই সে প্রকাশকে যোগ্য পাত্র দেখিয়ে দিয়ে সরে পড়েছিলো। সে ভেবেছিলো ছুটো বছরও অন্ততঃ ধৈর্য্য ধরে থাকবে। আর যদি সে প্রকাশকে বিয়ে করে সুখী হয়, সমরেশের বলবার কিছু নেই। প্রকাশও তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুতরাং তারা যদি সুখী হয় জীবনে, সমরেশের তো কোন অভিযোগই থাকতে পারে না। কিন্তু নন্দিতা তাকে ভুল বুঝে তার ওপর অভিমান করলো। কোন প্রতিবাদই সে জানালো না—স্বেচ্ছায় প্রকাশকে বিয়ে করলো; কিন্তু পাঁচজনের মত অনেক চেষ্টা করেও সে স্বামীকে আপন করে নিতে পারলো না।

চারিধারে বেজে উঠলো সাঁজের শঙ্খধ্বনি। নন্দিতা প্রদীপ হাতে ঘরে সন্ধ্যা দেখাতে এলো। সমরেশ ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো তার দিকে—চারিচক্ষুর হলো দৃষ্টি বিনিময়। সামান্য প্রদীপের আলোতেও সমরেশ লক্ষ্য করলো, নন্দিতার মুখে চোখে ফুটে উঠেছে আত্মনিবেদনের

ছায়া। প্রদীপটা মাটীতে রেখে নন্দিতা তার দিকে এগিয়ে আসে—নত-জানু হয়ে তাকে প্রণাম করলো। পায়ের ধূলো নিতে যেতেই সমরেশ চমকে ওঠে।

নন্দিতা ধীর কণ্ঠে বল্লে, ভয় পাবার কিছুই নেই। চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে বসে সমরেশ জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু এসবের অর্থ কি?

সযত্নে তার পায়ের ধূলো মাথায় দিতে দিতে বল্লে, কিছু না; রোজই তো সকাল সন্ধ্যে ঠাকুর প্রণাম করি; তোমাকে দেখে হঠাৎ আমার মনে হলো, হাতের কাছে জীবন্ত ঠাকুর ছেড়ে মাটীর ঢিপি বা পাষাণের কাছে মিছেমিছি মাথা কুটি কেন?

ব্যস্ত হয়ে সমরেশ বল্লে, নন্দিতা, আমার জীবনটা তো তুমি মরুভূমি করে দিয়েছো একেবারে! তাতেও কি তোমার সাধ মেটেনি। এখন চাও, আমার আজন্ম সাধনাকে জলাঞ্জলি দিতে—জীবনের আদর্শকে ব্যর্থ করতে?

তোমরা সবাই কাপুরুষ। মুখে যতই বড় বড় বুলি আওরাও না কেন, তোমরা ভীরুর অগ্রগণ্য। তোমরা ভয় করো, মনগড়া কয়েকটা সামাজিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানকে। তোমরা ভাব যে, সমাজে যা চলে না, সে রকম করলে হয়তো সমাজে বিশৃঙ্খলা বাঁধবে। বিশৃঙ্খলা যদিই বা বাঁধে, আমাদের ক্ষতি কি! সমাজকে তো আমরা চাই না আর সমাজ ও চায় না আমাদের!

কি যে তুমি বলতে চাও, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

নন্দিতা সমস্ত মান সম্ভ্রম ও লজ্জা ভুলে গিয়ে সমরেশের বুকের ওপর মুখ রেখে উত্তর দেয়, বুঝতে তুমি সব পার। শুধু মিথ্যার ভাণ করে অন্তরের সমস্ত সত্যকে চেপে রাখবার চেষ্টা করছো বৈ তো নয়!

সমরেশ জোর করে নন্দিতার বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে খানিকটা পেছিয়ে গিয়ে বল্লে, সত্যই তোমাকে আমি কোন দিনই ভুলতে পারবো না; কিন্তু সব চেয়ে বড় সত্য যে তুমি বিবাহিতা—পরস্ত্রী। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না—থাকা উচিতও নয়!

উচিত অনুচিতের কথা তুলে দরকার নেই। বলছো বিয়ের কথা ওটা তো আমাদের সমাজে একটা বিলাস মাত্র। মেয়েরা চিরকালই আশ্রয় খোঁজে; কাজেই নির্ভরশীল কোন আশ্রয় পেলেই তারা খুসী হয়—ভাল মন্দ বিচার করবার মত তখন তাদের মনের অবস্থা থাকে না। আমার ও ঠিক তাই হয়েছিল। বিয়েটা আমার কাছে একটা তুঃস্বপ্ন। সেই তুঃস্বপ্নটাকেই জীবনের শেষ সম্বল এবং একমাত্র পাথেয় ভেবে নিয়ে কাটিয়ে দিতে রাজী নই।

প্রদীপটা পশ্চিম বাতাসে মাঝে মাঝে নিবো নিবো হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সেটা নিবেও গেল শেষে। নন্দিতা বল্লে, আচ্ছা, আমাকে কেন নিয়ে চলো না তোমার সঙ্গে এলাহাবাদে?

কোন্ দাবী নিয়ে? তুঃখের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো সমরেশ।

যা তুমি স্বেচ্ছায় দেবে—তার বেশী কিছু চাইবো না আর চাইবারই বা আছে কি!

অন্ধকারেই তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সমরেশ বল্লে, অনেকক্ষণ হলো, তুমি সন্ধ্যে দেখাতে এসেছো ঘরে। দেরী হচ্ছে দেখে, হয়তো কেউ কিছু মনে করতে পারে! এবার তুমি যাও নন্দিতা।

আমাকে যেতে বলছো, মাথার ওপর ঐ এতটুকু সিঁদূর আছে বলে! তা' না হলে আগে যখন ওটুকু ছিল না, তখন তো কোন আলাপ করতে তোমার বাধে নি।

মিছেমিছি আমি তর্ক করতে চাই না। শুধু এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে আমি তোমাকে গ্রহণ করে তোমার নারীত্বের অবমাননা করতে পারবো না। এতবড় লজ্জা তোমাকে আমি কোন তুঃখে দেবো ভেবে পাচ্ছি না। সমাজে তোমার নামে একটা কুৎসা রটবে, লোকে তোমাকে ঘৃণা করবে—তা আমি কিছুতেই সইতে পারবো না।

নন্দিতা আর নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে তীব্র কণ্ঠেই বল্লে, তাহলে তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে না—তোমার আত্মসম্মানে বাধবে?

ঠিক তা নয়, তবে অন্যায়কে আমি কখনই প্রশ্রয় দিই নি আর এখনও দেবো না। তাতে সত্যই যদি তুমি ব্যথা পাও, বুঝবো ওটাই তোমার ভাগ্য।

ভাগ্য, ভগবান, সমাজ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য— ওসব উপদেশ আমাকে শুনিও না। আমি অনেক শুনেছি।

নন্দিতা ঝড়ের মতো ঘর থেকে চলে গেলো।

ভেরো

নন্দিতাকে অচলা সত্যই খুব ভালবাসতো। শ্বশুর বাড়ীতে সেইই ছিল তার একমাত্র সাথী। প্রকাশদের বাড়ীর দু' তিনখানা বাড়ীর পরেই ছিল তাদের বাড়ী। দুপুরবেলা প্রায়ই সে আসতো নন্দিতার সঙ্গে গল্পগুজব করতে। কোন কারণে সে নন্দিতার সঙ্গে দেখা করতে না পারলে, নন্দিতার মনটা ভারী খারাপ হোতো।

শ্বশুরবাড়ী থেকে এখানে আসার পর থেকে সে প্রায়ই অচলার চিঠি পেয়েছে। সবকটা চিঠিতেই সে তাকে শ্বশুর বাড়ীতে ফিরে যাবার জন্মে অনুরোধ জানিয়েছে। উত্তরে নন্দিতা জানিয়েছে, তার দুর্ভাগ্য যে স্বামীর ঘর-করা ভাগ্যে নেই। স্বামীর সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, কর্তৃত্ব, মর্য্যাদা

সব কিছুই লাভ করেছিলো সে। পায়নি শুধু স্বামীর অকৃত্রিম ভালবাসা।

হঠাৎ সেদিন অচলার চিঠি পেয়ে নন্দিতার মাথা ঘুরে গেলো। সমস্ত জগত মনে হলো অন্ধকার। অচলা জানিয়েছে, সম্প্রতি প্রকাশের সঙ্গে একটী মেয়ের খুব আলাপ হয়েছে। মেয়েটীকে সব সময়ই ওদের বাড়ীতে দেখা যায়—নাম তার অনিতা, দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। পাড়াঘরে একটা কাণা-ঘুষোও চলছে যে প্রকাশের সঙ্গে বোধ হয় অনিতার বিয়ে হবে। প্রকাশের মা নিজেই এ বিয়েতে উদ্যোগী। তবে এ বিয়েতে প্রকাশের মত পুরোপুরি পাওয়া যায় নি। অচলা তারপর নন্দিতাকে খানিকটা উপদেশ দিয়ে শেষে লিখেছে, যে হিন্দু মেয়ের বিয়েই হচ্ছে নারীত্বের প্রথম এবং প্রধান সোপান। স্বামীর ভালবাসা লাভ করতে হয় নারীকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে। অচলার মতে নন্দিতার উচিত শ্বশুর বাড়ীতেই গিয়ে থাকা ও স্বামীর সেবাযত্ন করে তার মন ও হৃদয় জয় করা। এতে যদি তাকে কৃচ্ছসাধন করতে হয়, তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই—কেননা এই হচ্ছে হিন্দুনারীর প্রকৃত সাধনা এবং অশেষ গৌরবের কথা।

অচলার চিঠিটা সে আগাগোড়া ভাল করে পড়ে বিছানার ওপর শুয়ে পড়লো। খানিকটা কাঁদবার পর দেহ ও মন যখন একটু হালকা হোলো সে ভাবলো, প্রকাশের কাছেই সে ফিরে যাবে। তবু তার এ অবস্থায় মনে পড়ে সমরেশের

কথা। নন্দিতা এখন বুঝিতে পারে যে, সে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করেছে আর সেই সঙ্গে করেছে অপর একজনের জীবনকে দুঃখময়। সমরেশের ওপর তার অভিমান করাটাই তার যত অনিষ্টের মূল। সে যে কি করবে স্থির করতে পারলো না। ভাবলে, এ বিষয়ে সে সমরেশের পরামর্শ গ্রহণ করবে। সমরেশ যদি তাকে শ্বশুর বাড়ী যেতে বলে, সে যাবে। একবার মাত্র সে তার অবাধ্য হয়েছিল, তাতেই তার দুঃখের অন্ত নেই সুতরাং তার কথা অমান্য করবার মত দুঃসাহস আজ আর তার নেই।

নন্দিতা নিজের ঘর ছেড়ে বারণ্ডায় এলো। রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখলো, একটী মেয়ে তাদের বাড়ীর সদর দরজার ওপর নম্বর প্লেটটার দিকে একবার দেখে নিয়ে একটু একটু করে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। নন্দিতা ভাবলো মেয়েটীর নিশ্চয়ই কিছু দরকার আছে। কাকে যেন সে খুঁজছে। সে তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কাকে খুঁজছেন?

মেয়েটী তার দিকে চেয়ে বললে, আমি নন্দিতা দেবীকে খুঁজছি! তিনি কি এখানে থাকেন?

হ্যাঁ, আমিই নন্দিতা, কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না, কখনও দেখেছি?

মেয়েটী হেসে ভ্যানিটী ব্যাগটা মৃদুমন্দ নাড়তে নাড়তে সোজা বারণ্ডার ওপরে এসে দাঁড়ালো। শ্যেন দৃষ্টি দিয়ে

নন্দিতার আপদমস্তক একবার দেখে নিয়ে বল্লে, না. আমাকে আপনি চিনবেন না। আমি এসেছি একটা বিশেষ খরব দিতে আপনাকে। কথাটা হয়তো একটু কটু লাগবে শুনতে। প্রথমে ভাবলুম, কি দরকার আমার এসবের মধ্যে থেকে। কি জানি কেন, তবু এলুম যদি কিছু আপনার উপকার করতে পারি।

নন্দিতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে. আপনার হেঁয়ালি তো আমি আদৌ বুঝতে পারছি না। আসল কথাটা কি পরিস্কার করে বলুন।

বলবো বলেই তো এসেছি বোন। স্ত্রী-জাতির প্রতি স্ত্রী-জাতির যদি টান না থাকে, তবে বাংলার মেয়েদের দুঃখ কে বুঝবে বলুন তো ?

আপনি কি পাগল !

মেয়েটী এক নিঃশ্বাসে বলে গেলো, হয়তো হবে, কিন্তু যদি জানতে চান, আমার এমন দশা কে করলে—আমি মুক্ত-কণ্ঠে বলবো প্রকাশ বাবু।

নন্দিতা চমকে ওঠে ; জিজ্ঞেস করে কি নাম বল্লেন আপনি ?

প্রকাশবাবু—আপনার স্বামী।

তাঁর সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ ! কি করেছেন তিনি আপনার ?

আমার নারীত্বের অবমাননা।

তার মানে ?

সেই কথাটাই তো জানাবার জন্যে আমার এখানে আসা। আপনি কাঁদছেন—আমারও দুঃখের শেষ নেই। তবে সমাজ আপনাকে কিছুতেই দোষ দিতে পারবে না, কেননা আপনার মাথায় ঐ সিঁদুরটুকু রয়েছে বলে। আর আমার লজ্জা ঢাকবার কোন চিহ্ন নেই—আজও আমার বিয়ে হয় নি। পুরুষ এমনি নিলর্জ্জ যে তারা ভাবে, কুমারী মেয়েদের নিয়ে যে ভাবে ইচ্ছা খেলা করা যেতে পারে! ফুলের মত সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত মধু নিঃশেষ করে তাদের অনাদরে পথের ধূলিতে ফেলে দিতে এতটুকুও তাদের প্রাণে বাধে না এমনি স্বার্থপর তারা!

নন্দিতা আগন্তুকের একখানা হাতধরে বল্লে, কি হয়েছে আপনার, কিছু তো বুঝতে পারছি না। আসুন ঘরের ভেতর। একরকম টেনেই সে তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে, একখানা চেয়ার দেখিয়ে বল্লে, বসুন এখানে।

মেয়েটী বসলে নন্দিতা বল্লে, আপনি ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। একটু সুস্থ হন—তারপর আপনার কথা শুনবো।

নন্দিতার মাথাটা ও কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছে, পা দুটো টলছে—হয়তো এখুনি পড়ে যাবে। সেও আস্তে আস্তে পাশের চেয়ার খানায় বসে পড়লো।

অনিতা সমস্ত লজ্জা ত্যাগ করে প্রকাশের কাছে আত্মনিবেদন করলো। প্রতিদানে সে লাভ করলো লাঞ্ছনা, গঞ্জনা

ও প্রত্যাখ্যান। নিদারুণ দুঃখে তার হৃদয় ভেঙ্গে পড়লো। প্রতিহিংসা নেবার জন্যে সে সুযোগ খুঁজতে লাগলো। সে ভাবলো যখন তার নিজের বরাত ভেঙ্গেছে, তখন সে ওদের স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রাচীর রচনা করে তাদের জীবনকে বিষময় ও দুর্ব্বিসহ করে তুলবে। কথার পর কথার জাল বুনে নন্দিতাকে বুঝিয়ে দেবে যে তার স্বামী অসচ্চরিত্র, লম্পট ও নিতান্ত অপদার্থ। এইজন্যেই নিতান্ত অপরিচিত হয়েও সে আজ নন্দিতার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

খানিক পরে অনিতা নন্দিতার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলে, এখন বোধ হয় কথাটা বলতে পারি—আর যদি না শোনেন তো চলি। আপনাদের দেশে এসেছিলাম বেড়াতে। আজই, চলে যাব ঠিক করেছি। ভাবলুম যখন এখানে এসেছি আর যখন আপনার খবরটাও পেলুম, তখন কথাটা আপনাকে জানান দরকার—যদি আপনি তাকে ফেরাতে পারেন।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে নন্দিতা জিজ্ঞেস করলে, কেন, কি হয়েছে তাঁর ?

তার অধঃপতনটা আপনি চোখে না দেখলে, বিশ্বাস করতে চাইবেন না। অমন ছেলে, নাম করা ডাক্তার—তার কি ওমনিভাবে দিনরাত নাচিয়ে গাইয়ে নিয়ে হো হা করে বেড়ানো ভাল দেখায়! উঁচু বংশের ছেলে বলেও তো একটু চক্ষুলজ্জা থাকা উচিত।

নন্দিতা অনিতার সমস্ত কথাগুলিই সত্য বলেই ধরে নিয়েছে। তাই নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, তা'হলে এখন তিনি আর ডাক্তারি করেন না!

করবেন আর কখন বলুন! ডাক্তারখানা এখন হয়ে উঠেছে নাচঘর। সন্ধ্যে নেই, দুপুর নেই—সেখানে চলেছে শুধু হাসির ফোয়ারা; বন্ধু বান্ধবও জুটেছেন ঐ ধরণের অনেকগুলি—সঙ্গে চলেছে মদ। পাড়ার লোক কিছু বলতে এলে সকলে তেড়ে মারতে যান। কারুর কোন উপরোধ, অনুরোধ বা উপদেশ তিনি কাণেই তোলেন না। দূর থেকে কেউ কখনও ডাক্তার হিসেবে ডাকতে এলে, তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন দোরগোড়া থেকে।

মেয়েরা অনেক কিছু কষ্ট সহ্য করতে পারে; শুধু পারেনা সইতে স্বামীনিন্দা, সে স্বামী তার যত খারাপই হোক না কেন! নন্দিতা ধৈর্য্য ধরে অনিতার কথা শুনলো। শুনে তার না হলো রাগ, না দুঃখ—তার ইচ্ছে করছে শুধু হাসতে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ক্রমান্বয়ে হাসতে; হয়তো তাতেই সে শান্তি পাবে। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলো মেয়েটীর দিকে অপলক নেত্রে। মেয়েটী উঠে বল্লে, তা'হলে যাই আমি।

নন্দিতা কোন উত্তর দিলো না। শুধু শোনা গেলো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস। অনিতা আস্তে আস্তে টেবিলের ওপর থেকে তার ভ্যানিটী ব্যাগটী উঠিয়ে নেয়—হাততুলে নমস্কার

করে তাকে বিদায় জানায়। তবুও নন্দিতা কোন উত্তর দিলো না। অনিতা বারণ্ডা পার হয়ে রাস্তায় নামলো। একবার ঘাড় ফিরিয়ে সে নন্দিতার দিকে তাকালো ; মুখে তার হাসির রেখা। আর নন্দিতা একই ভাবে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে—ভাবলেশহীন ভাবে তাকিয়ে শূন্যপানে।

চোদ্দ

মানুষের ভুল হয় আর সেই ভুল ঢাকতে গিয়ে সে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। তাতে ভুলের সংশোধন হয়ই না—বোঝা ক্রমশঃ বেড়েই চলে আর তার সঙ্গে এসে যোগ দেয় পাপ। মানুষের মন ওঠে বিষিয়ে। অনুশোচনার তার অন্ত থাকে না, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পাগলের মত যা তা করে বসে। কেউ ডোবে জলে, কেউ গলায় দড়ি দেয়, কেউ বা বিষ খেয়ে জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়। কতক বা বেছে নেয় পাপের পঙ্কিল পথ। ধাপে ধাপে সে নেমে যায় মানুষের সমাজের বাইরে। হয়তো সেখানেও সে শান্তি পায় না। দেহের বা মনের ক্ষুধা কিছুমাত্র তার তৃপ্ত হয় না। বুকের ব্যথা ও চোখের জলের মধ্যেই বাকী সকলের জীবন শেষ হয়। উপযুক্ত স্বামী পাওয়া সত্ত্বেও নন্দিতা পর পুরুষের চিন্তা করে ; সে ভালবাসে সমরেশকে।

সুতরাং তার চেয়ে দুঃখিনী, তার মত হতভাগ্য আর কে আছে!

সমরেশ এখানে আসার পর থেকে, নন্দিতা মাঝে মাঝে এমন অসংযত আচরণ করেছে, এমন পাগলামি করেছে যে, পুরুষের পক্ষে সে লোভ সত্যই সংবরণ করা শক্ত। সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজেকে সংযত রাখতে। নন্দিতাকে বুঝিয়েছে অনেক কিন্তু কোন ফলই হয়নি তার।

এখানে এসে নন্দিতার মাসতুতো বোন নমিতার সঙ্গে সমরেশের পরিচয় এমন কি অন্তরঙ্গতাও হয়ে গেলো। রূপে ও গুণে সে নন্দিতার সমকক্ষ না হলেও খুব যে নিকৃষ্ট—তাও বলা চলে না। সমরেশ ঠিক করে তাকেই সে বিয়ে করবে। বিয়ে করা তার এখন নিতান্ত দরকার। নমিতাকে বিয়ে করে সে নন্দিতাকে ভুলতে চায়। সমরেশের বিয়ে হয়ে গেলে তার সঙ্গে আলাপ করতে নন্দিতার আপনাথেকেই বাধ বাধ ঠেকবে। যে দাবী নিয়ে সে এখনও সমরেশের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা, মান অভিমান করে তা ক্রমেই শিথিল হয়ে আসবে।

এই সব ভেবেই সমরেশ নমিতার বাবার সঙ্গে কথা কয়ে বিয়ের প্রায় পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেললো। সমরেশ নমিতার বাড়ী যায়, সেও আসে মাঝে মাঝে ওদের বাড়ী। দু'জনে মিলে গল্পগুজব করে এই পর্য্যন্ত। এর বেশী খবর নন্দিতা জানে না, আর জানতেও চায় না।

সন্ধ্যেবেলা ঘরের ভেতর একটা সবুজ আলো জ্বলছে। সমরেশ ও নমিতা একটা কৌচে পাশাপাশি বসে গল্প করছে। কথায় কথায় সমরেশ বল্লে, ভাল করে ভেবে দেখো নমিতা, তুমি আমায় বিয়ে করতে পার কিনা।

নমিতা বল্লে, তুমি কি আমায় বিয়ে করলে সুখী হবে না, মনে করো ?

আমিতো ভাবছি, তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করলে সুখী হবো না। তোমাকে লাভ করলে, সত্যি বলতে দোষ নেই নমিতা, সমস্ত গ্লানি কেটে যাবে ; জীবনে আমার চির বসন্ত বিরাজ করবে—বোধ হয় আর কোন দুঃখই থাকবে না আমার।

তুমি যদি আমাকে বিয়ে করে সুখী হও, আমিই বা হবো না একথা তোমার মনে হলো কি করে ?

পাছে তুমিও ভুল করো, সেইজন্যই ভেবে চিন্তে কথা বলতে বলছি।

নমিতা ছোট্ট মেয়ের মত আবেগে দু'হাতে সমরেশের গলা জড়িয়ে ধরে বল্লে, তুমি এখনও আমায় চিন্‌তে পারলে না। বুঝতে পারলে না যে আমি তোমাকে কত ভালবাসি। তোমরা বড় অবুঝ ; তোমরা জান না, যে একবার সত্যি কাউকে ভালবাসে, তার স্মৃতি সে কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। যে দাগা মেয়েরা একবার পায়, তার ছাপ চিরকালই মনের আরসীতে

থাকে। সমরেশ নমিতার চুলের ভেতর আঙুল দিতে দিতে বল্লে, সত্যি কথাটা বলে তোমাকে আমি অনেক ব্যথা দিলুম নমিতা—আমায় তুমি ক্ষমা করো।

বিয়ের আগে যা খুশি তুমি বলো, আমি কিছু বলবো না। তারপর দেখো সব কিছু আমি সুদে আসলে আদায় করতে পারি কি না! সমরেশের গলা ছেড়ে দিয়ে দুষ্টুমীর হাসি হেসে নমিতা কয়েক পা পেছিয়ে যায়।

সমরেশ লাফিয়ে উঠে তাকে ধরে পাশে বসিয়ে বল্লে, এইবার কি হয়?

এমনি সময় নন্দিতা এসে ঘরে ঢুকলো। দিদিকে দেখেই সে তাড়াতাড়ি উঠে পালাবার চেষ্টা করছিলো, সমরেশও হতবুদ্ধি হয়েছিলো কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে। কিন্তু সে নমিতাকে পালাতে না দিয়ে সুদৃঢ়ভাবে আলিঙ্গনে বদ্ধ করলো—নমিতা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো।

সমরেশ এসে অবধি নন্দিতাকে অনেক বুঝিয়েছে, তাকে ভোলবার জন্যে; কিন্তু সে নিয়তই চুম্বকের মত তাকে আকর্ষণ করেছে—মাঝে মাঝে সমরেশও নিজেকে হারিয়ে ফেলতে বসেছিলো। নন্দিতার অকৃত্রিম ভালবাসার ওপর সে পাপের কালিমা লেপন করতে চায় না। তাই না, নমিতার সঙ্গে সমরেশের এই ছেলেমানুষী—তাকে বিয়ে করবার জন্যে এত ব্যস্ততা। কাজেই সে এ সুযোগ ত্যাগ করতে পারলে না। নন্দিতার সামনে প্রেমের

অভিনয় করে সমরেশ তার প্রাণে গভীর আঘাত দিতে চায়, যাতে সে সমরেশের সব কিছু ভণ্ডামী মনে করে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে দূরে চলে যায়।

স্তব্ধভাবে নন্দিতা তাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। সমরেশই প্রথমে কথা বল্লে, আচ্ছা নন্দিতা, যে সত্যিকার গৃহিণী হবে, তার সঙ্গে একটু যদি হাসি ঠাট্টা করি, তা হলে কি লোকে অপযশ গাইবে?

কথাটা যেন ভাল করে বুঝতে পারে নি, এমনি ভাব দেখিয়ে নন্দিতা জিজ্ঞেস করলে, তার মানে, তুমি নমিতাকে বিয়ে করবে!

একটু হেসে সমরেশ বল্লে, হ্যাঁ, সবই প্রায় ঠিক হয়ে গেছে একরকম। শুধু বাকী আছে দিন স্থির হতে। সবাই জানে এ কথাটা, তুমিই জানো না—ভারী আশ্চর্য্য তো!

ওঃ, বলে নন্দিতা ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। পা দুটো টলছে তার—তাতে কোন জোর নেই যেন; সমস্ত দেহটা ভারী পাষাণের মত মনে হলো। কোন রকমে দরজাটা ধরে সে সিঁড়ির কাছে এলো।

সমরেশও তার সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে। সে ভাবে আজ চরম অভিনয় করতে হবে। তার কেবলি মনে হয়েছে যা তারা করে চলেছে, ভাল নয়। শিক্ষিত সমাজ যখন তাদের এই গোপন প্রণয় জানবে, তখন তারা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে না? সমরেশ নন্দিতাকে বল্লে,

নন্দিতা! তোমাকে নিয়ে শুধু আমি খেলা করেছি— ভাল আমি বাসিনি কোনদিন।

অপলকদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে নন্দিতা জিজ্ঞেস করলে, সত্যি বলছো সমর?

হ্যাঁ, এতে মিথ্যের কি আছে! যৌবনের প্রথম উন্মাদনায় আমারও মনে কামনা জেগেছিলো; যখন দেখলুম, তোমাকে বিয়ে করতে হবে, গেলুম বিলেতে পালিয়ে, শুধু তোমার হাত থেকে অব্যাহতি পাবো বলে।

নন্দিতার মুখে কোন ভাষা নেই—চোখ বেয়ে তার কয়েক ফোঁটা জল পড়লো গড়িয়ে।

তারপর ....

হা হা হা, অট্টহাসি হেসে উঠলো নন্দিতা। হাসতে হাসতে সিঁড়ি বেয়ে সে নীচে নামতে লাগলো। নমিতা ঘরে ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছে—কি করবে কিছুই ভেবে পেলো না।

নন্দিতা! তোমার হলো কি! চীৎকার করতে করতে সমরেশ দৌড়ে এলো তার কাছে।

নন্দিতা সিঁড়ির মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে; মুহূর্তের জন্যে যে শান্ত হয়। বারেক তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। সমরেশ লক্ষ্য করলো—সুন্দর লাবণ্যময় নন্দিতার মুখখানি কী বীভৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে; যে চাহনি দেখে সমরেশ মুগ্ধ হয়েছিলো, সে চোখের দিকে তাকাতে

তার সাহস হোলো না। সেখানে মায়া নেই, মমতা নেই—হিংসার কুটিলতায় তা ভরে উঠেছে। সমরেশ জিজ্ঞেস করলো, অমন করছো কেন নন্দিতা? দুর্-দুর্ করে নন্দিতা বাকী সিঁড়ি ক'টা নেমে এলো। আবার সেই হাসি। মনে হয় বুঝি বাড়ীটা তার হাসির ভার সহ্য করতে না পেরে এখুনি ভেঙ্গে পড়বে!

সমরেশ তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলো, নন্দিতা! নন্দিতা!

তখন তার হাসি থেমে গেছে। আলস্যে চোখ আসছে জড়িয়ে—সে কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে। সমরেশ তাকে ধরে রাখতে পারলো না। সে পড়লো মেঝের ওপর সজোরে—পড়েই অজ্ঞান।

পনেরো

নন্দিতা অজ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীতে একটা হুলুস্থুল পড়ে গেলো। জল আন, বাতাস কর, ডাক্তার ডাকো ইত্যাদি হৈ হৈ শব্দ। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার এলেন। মনোযোগের সঙ্গে কিছুক্ষণ রোগীকে পরীক্ষা করে তিনি বল্লেন, এ রোগ শারীরিক নয়—সম্পূর্ণ মানসিক। অত্যধিক মানসিক উত্তেজনায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে মস্তিষ্কে ভয়ানক

আঘাত লেগেছে—হার্টও রোগীর খুব দুর্ব্বল। যাতে তার আর কোনরূপ মানসিক চাঞ্চল্য না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। আর সেই সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে চাই এর সেবা শুশ্রূষা করা।

বৃদ্ধ যোগেনবাবু একমাত্র মেয়ের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে একেবারে দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। তিনি ডাক্তারের হাতদুটো ধরে বল্লেন, ডাক্তারবাবু সংসারে আমার ঐ একমাত্র মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই; বলুন আপনি ভয়ের কোন আশঙ্কা নেই।

আপনি অতো উতলা হবেন না; শান্ত মনে কর্ত্তব্য করে যান—আমরাও যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। আশা করি, উনি ভালই হয়ে উঠবেন।

কিন্তু জ্ঞান হবে কখন? উৎকণ্ঠায় বৃদ্ধের মন ভরে উঠেছে।

নিশ্চয়ই কাল সকালে কিংবা সন্ধ্যেতে একবার জ্ঞান ফিরে আসবে। কিন্তু খুব সাবধান, ওঁর কাছে কান্নাকাটি, হাসি তামাসা, এমন কি জোরে কেউ কথা পর্য্যন্ত বলবেন না।

কেন?

তাহলে উনি হয়তো পাগল হয়ে যেতে পারেন কিংবা এমন শক্ পাবেন, যাতে জীবনও বিপন্ন হতে পারে। কাজে কাজেই আগে থেকে আপনাদের সবাইকে খুব সাবধানে ধৈর্য্য ধরে থাকতে বলছি।

নিশ্চয়ই থাকবো বলে, যোগেনবাবু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

নমিতা তাঁকে ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেলো।

পুরো একদিন নন্দিতা অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নমিতার মাও এসেছেন অসুখের খবর পেয়েই। রোগীর শিয়রে তিনি ও নমিতা বসে। চোখ বুজে শুয়ে আছে নন্দিতা। দেখে মনে হয় পরম আরামে সে যেন নিদ্রা যাচ্ছে। মুখখানি তার আনন্দে যেন ভরে উঠেছে। এলায়িত কুন্তলদামের মধ্যে তার কমনীয় মুখখানি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

নন্দিতার অবস্থা দেখে সমরেশের দুঃখের অবধি নেই। তার কেবলি মনে হচ্ছে নন্দিতার জন্যে দায়ী সে একা। কাজেই তার ভালমন্দ একটা কিছু হলে, তার অনুশোচনার কিছুতেই শেষ হবে না। যে দুঃখ সে নন্দিতাকে দিয়েছে সত্যই তা দুর্ব্বিসহ। নন্দিতা তাকে ভুলে যেতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলো কিন্তু কোন যুক্তি তর্ক দিয়ে সে তার নিজের ভালবাসাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারেনি। সংসার করবার সমস্ত আশাই তো তার শেষ হয়ে গেছে। জীবনের কোন মাধুর্য্য, কোন সৌন্দর্য্য, বেঁচে থাকায় কোন আনন্দই আর হৃদয়-বীণাতন্ত্রীতে গিয়ে ঘা দিয়ে তার মন-প্রাণকে নাচিয়ে তোলে না। যা সে হারিয়েছে, তার জন্যে সে অসংখ্য দীর্ঘনিশ্বাস এবং অবিরল চোখের জল তো ফেলেছে।

সমরেশকে সে বিয়ে করতে পারেনি সত্য কিন্তু জাগ্রতে, স্বপনে, নিদ্রায় অতি সন্তর্পণে সে নিয়তই তার মূর্ত্তি গড়েছে তার মনের গহন কোণে আর চোখের জলে সে পূজো করেছে তার সেই প্রিয়তমের। সামনে তো তার সমস্ত কাল রাত্রি —সেখানে সুখ নেই, শান্তি নেই, বেঁচে থাকবার লোভ নেই একটুও।

আঘাতের পর আঘাত খেয়ে নন্দিতার জীবনটা পাষাণের মত শক্ত হয়ে গিয়েছে। বিয়ের পর থেকে তিন বছর সে সমরেশের দেখা পায় নি। সমরেশও কোন খোঁজ খবর নেয়নি। দু'জনেই বুঝেছিলো এই ভাল। সমরেশ ভাবলো নন্দিতাকে সে ভুলে গেছে। নন্দিতাও ভাবলো এইভাবে সমরেশের সমস্ত স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলে তাকে সে ভুলে যেতে পারবে অদূর ভবিষ্যতে। প্রাণের ভেতর ভালবাসার যে আগুণ তার একবার জ্বলে উঠেছিলো, তা এখনও নির্ব্বাপিত হয় নি। সব সময়েই সেটা জ্বলেছে অতি ধীরে, অত্যন্ত সন্তর্পণে। সমরেশের এখানে বেড়াতে আসার সঙ্গে সঙ্গে সেটা উঠলো হঠাৎ জ্বলে, দ্বিগুণ উৎসাহে।

সমরেশের চিন্তা নন্দিতা মন থেকে একেবারে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। সময় অসময়ে সে সমরেশের দেখা পাবে, তার সঙ্গে হেসে কথা কইবে, কখনও তার কাছে পুরোণো দিনের মতো আব্দার করবে, কখনও বা তাকে কোন একটা দুরভিসন্ধি জানাবে, আবার কখনও তার ওপর অভিমান

করে তাকে তীরস্কার করবে, এই নিয়েই সে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে চায়। এইটুকুই তার দুঃখময় জীবনে একমাত্র সম্বল। কেন না, সে ভাল করেই জানে যে, যা পাবার নয় তা কোন মতেই সমরেশের কাছ থেকে আদায় করা যাবে না।

নন্দিতা যখন শুনলো যে সমরেশ তারই ছোট বোন নমিতাকে বিয়ে করবে, তখন তার রাগ হলো ভয়ানক। আর সেই সঙ্গে হলো, নমিতার ওপর হিংসা। সমরেশকে সে কারুর হাতে ছেড়ে দিতে চায় না। তার শুধু ভয়, সমরেশ বিয়ে করলে তার সবটুকু ভালবাসাই তো তার ভাবী স্ত্রী এসে পূর্ণভাবে দখল করবে। যেটুকু স্নেহাদর সে সমরেশের কাছ থেকে এখনও লাভ করছে, তাও সে পাবে না ; তখন সে কি নিয়ে সংসারে বাস করবে ? কোন আশাতে সে তার মনকে বেঁধে রাখবে।

নন্দিতার শোবার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের ওপর রয়েছে নন্দিতা ও সমরেশের দু'খানা ছবি—একই ফ্রেমে পাশাপাশি বাঁধানো। নন্দিতা সমরেশের কাছে একবার একটী ফটো চাওয়াতে সমরেশ এটা তাকে উপহার দিয়েছিলো। এটা দেখলে মনে হবে যে তার ওপর নিশ্চই একজনের প্রখর দৃষ্টি আছে সব সময়ে ; তা' না হলে ছবিখানি অত ঝকঝকে তকতকে থাকে না। নন্দিতা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে ছবিখানিকে ঝাড়েমোছে।

সমরেশ ফটোতে নন্দিতার ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ভাবছে তার কালেজী জীবনের কথা। যোগেনবাবু সাধারণতঃ একটু আমোদে লোক। কিন্তু নন্দিতা অসুস্থ হবার পর থেকে তিনি ভীষণ গম্ভীর প্রকৃতি হয়ে পড়েছেন। কারুর সঙ্গে বড় একটা কথা কন না, চুপচাপ একেলা বসে কি যেন ভাবেন। বার বার কোন কথা জিজ্ঞেস করবার পর তিনি সংক্ষেপে তার জবাব দেন। চলাফেরাও তিনি করছেন খুব নিঃশব্দে। কখন যে তিনি ঘরে ঢুকে সমরেশের পেছনে দাঁড়িয়েছেন, সমরেশ টের পায় নি।

সমরেশের পিঠে ধীরে ধীরে তিনি একখানা হাত রাখতেই সমরেশ চমকে উঠে পেছন ফেরে। যোগেনবাবু ডাকলেন, সমরেশ। সমরেশ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি মেসোমশাই ?

আমি তো ভাল বুঝছি না কিছু। তুমি প্রকাশকে এখুনি একটা তার করে দাও আর পার তো একবার কলকাতা গিয়ে তাকে নিয়ে এসো।

প্রকাশকে এখানে আসবার জন্যে জরুরি তার করে দিয়েছি কাল বিকেলেই। কিন্তু সে আসবে কিনা বলতে পারি না।

না সমর, তার পেয়েও সে আসবে না। জীবনে সেও দুঃখ পেয়েছে অনেক। আমি জানি সে বড় অভিমানী— তাকে জোর করে ধরে না আনলে সে লজ্জায় এখানে আসতে পারবে না।

বেশ আপনি যদি বলেন যেতে, আমি যাব।

আমি আর কি বলবো সমর। তুমিই ভেবে দেখোনা, এখন তার এখানে আসা প্রয়োজন কি না ?

স্বামী হয়ে যদি সে নন্দিতার অবস্থা শুনেও অভিমান করে বসে থাকে, আমি তাকে ডেকে আনবো ডাক্তার হিসেবে ; কেন না এক্ষেত্রে তার মত একজন বড় ডাক্তারের সত্যিই বিশেষ দরকার। আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমি আজকের ট্রেনেই কলকাতা রওনা হবো।

দেখ সমর, পৃথিবীতে আমার আপনার বলতে বড় একটা কেউ নেই ; আর থাকলেও, তোমার মত তাদের ওপর আমি জোর করতে পারি না। তোমাকে যে আমি কত আপনার মনে করি, তা একা আমি জানি আর জানেন ভগবান। এই বলে যোগেনবাবু সমরেশের মাথার ওপর ডান হাতখানা রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন, আমি প্রার্থনা করছি, ভগবান তোমায় সুখে রাখবেন। যেমন নিঃশব্দে তিনি ঘরে ঢুকেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দেই চলে গেলেন।

বেশভূষার পারিপাট্য সমরেশের চিরকালের। মিহি কাপড়, গিলে করা পাঞ্জাবী, সদ্য বরুশ করা চকচকে জুতো না পরলে সে রাস্তায় বের হতে পারতো না। সব সময়েই চুল সুবিন্যস্ত রাখা তার একটা অভ্যেস। নিতান্ত সাধারণের মত পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করলে তার বড় অস্বস্তি বোধ হতো। কিন্তু নন্দিতা অসুস্থ হওয়ার পর থেকে সেদিকে

তার আর কোন দৃষ্টি নেই। সময় মত খাওয়া দাওয়া সে ছেড়ে দিয়েছে। পুরো একটা দিন কেটেছে জেগে নন্দিতার শিয়রে বসে, তার তদারক করতে। আধ ময়লা কাপড় জামা পরে এবং ঘরে চলাফেরা করবার জন্যে যে জুতো-জোড়াটা তার পায়ে ছিল, সেটাই পায়ে দিয়ে, অভুক্ত অবস্থাতেই সে রওনা হ'লো।

হাওড়া ষ্টেশনে যখন গাড়ী এসে পৌছলো তখন ন'টা বেজেছে। শ্রান্তি, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় সে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। ভাবনাতে মাথাটা ভারী পাষাণের মত মনে হচ্ছে। যতদূর পারা যায় তাড়াতাড়ি করে সমরেশ প্রকাশের বৌবাজারের বাড়ীতে এসে পৌঁছলো। খোঁজ নিয়ে জানলো যে প্রকাশ সে বাড়ী বিক্রি করে দিয়ে সম্প্রতি বালীগঞ্জে নিজস্ব নতুন বাড়ীতে বাস করছে। বহুকষ্টে ঠিকানা সংগ্রহ করে সে বালীগঞ্জের বাসে উঠলো। বাস থেকে সে যখন নামলো, মাথাটা তখন ঝিম ঝিম করছে, পা দুটো টলছে মাতালের মত। রাসবিহারী এভিন্যুর ওপর আধুনিক রুচি সঙ্গত প্রকাশের ত্রিতল বাড়ী। সামনে গ্যারেজে বেশ সুন্দর একখানা মোটর রয়েছে। বাড়ীটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সমরেশ দরজার ওপর আঁটা কলিং বেলটা টিপলো। সঙ্গে সঙ্গেই একজন চাকর বেরিয়ে এলো। তাকে জিজ্ঞেস করে সমরেশ জানলো যে বাবু সবে মাত্র বাইরে থেকে ঘুরে এসে

বিশ্রাম করছেন। চাকরটীর কাছ থেকে একটা পেন্সিল ও এক টুকরো কাগজ চেয়ে নিজের নাম ঠিকানা লিখে দিতে সে কাগজটা নিয়ে ভেতরে গেলো। সমরেশ আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে সেই দরজার সিঁড়ির ওপর ধুলি মলিন জায়গাটায় বসে পড়লো।

হন্তদন্ত হয়ে প্রকাশ ছুটে আসে বন্ধুর কাছে। সমরেশকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে সবিস্ময়ে বল্লে, আরে সমরেশ যে! এখানে বসে কেন? ভেতরে আয়।

সমরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধুর দিকে একবার তাকিয়ে বল্লে, প্রকাশ····· কিন্তু বলবার কোন ভাষা না খুঁজে পেয়ে নীরবে মাথা নীচু করলো।

হাতধরে বন্ধুকে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে প্রকাশ বল্লে, একি চেহারা হয়েছে তোর! খবর কি বলতো?

নন্দিতার বড্ড অসুখ; বুঝি আর বাঁচবে না। তোকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

অসুখটা কি?

সমরেশ সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে দিতে প্রকাশ বল্লে, মানসিক উত্তেজনা। ডাক্তাররা ওষুধ দিয়ে রোগীর দেহটাকে নিরাময় করে তুলতে পারে; কিন্তু মানুষের মনকে জয় করবার মত ডাক্তারি শাস্ত্রে কোন ওষুধ আছে বলেতো আমার মনে হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে আমার যাওয়া না-যাওয়া একই কথা। আর আমি

গেলে হিতে বিপরীতই হবার সম্ভাবনা বেশী। কেন না, আমাকে সে দেখতে পারে না আদৌ—কাজেই আমার না যাওয়াই ভাল। বরং তুই আছিস ভালই হয়েছে। তোর হাতের সেবাশুশ্রূষা পেলে সে শীঘ্রই নিরাময় হয়ে উঠবে। পদ্মফুলের দূর থেকে সৌন্দর্য্যই দেখলুম; কাঁটার ব্যথাই আমাকে অতিষ্ঠ করে তুললো—তাকে স্পর্শ করবার সৌভাগ্য হলো না। তুই পেরেছিস সেই কাঁটাকে অগ্রাহ্য করে তাকে আপন করে নিতে; সুতরাং তুই আমার চেয়েও ভাগ্যবান।

কথাগুলো ঠিক বুঝতে না পেরে সমরেশ বল্লে, কিন্তু এসব কথার মানে কি প্রকাশ?

'মানে খুবই সোজা এবং পরিষ্কার। নন্দিতার স্বামী হয়েও যেটুকু অধিকার লাভ আমি করতে পারিনি, তুই তার বন্ধু হয়ে সে অধিকারটুকু লাভ করেছিস বিনায়াসে।

তুই ভুল করছিস প্রকাশ।

আগে আমি ভুল করেছি সত্যি এবং সে ভুলের জন্যই আমার অনুশোচনার অন্ত নেই। কিন্তু এখন যা বলছি তা নিছক খাঁটী কথা।

একটু জোর গলায় সমরেশ বল্লে, দেখ্ প্রকাশ, এখানে আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া করবো বলে আসিনি। তোকে আমি ডাকতে এসেছি, ডাক্তার হিসেবে। পত্নী

বলে তাকে স্বীকার করতে যদি না চাস না করলি কিন্তু তোকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে প্রকাশ বল্লে, না, আমার সময় নেই ; আর যদি বড় ডাক্তার দেখাতে হয়, আমি কয়েকজনের নাম করছি, তাদের যাকে হয় সঙ্গে নিয়ে যা। তারা প্রত্যেকেই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ।

অন্য কাউকে ডাকবার দরকার নেই। আমি এসেছি যে ডাক্তারের কাছে তাকেই যেতে হবে। তুই ভুলে যাচ্ছিস প্রকাশ, কি ব্রত, কি সংকল্প নিয়ে ডাক্তাররা ব্যবসাতে নামে। ঝড়জল, শীতগ্রীষ্ম, অসুখবিসুখ, বিপদ-আপদকে তুচ্ছ করে জগতের হিতসাধনে যারা নাম লেখায়, তাদের কি স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মান অভিমান করা শোভা পায়? নিজের দায়িত্ব পরের কাঁধে চাপিয়ে দিলে হয়তো প্রাণে খানিকটা স্বস্তি, খানিকটা আনন্দ লাভ করা যায় ; কিন্তু ভগবানের নির্ম্মম বিচারে তাকে জবাবদিহি করতেই হবে।

জানিস সমর, আমার হৃদয়ে যে দুঃখ জমা আছে তা লোককে জানাবার নয় ; আমি যাব না ঠিক করেছিলুম, কিন্তু তোর কথাতে যাচ্ছি ডাক্তার হিসেবে, স্বামী হয়ে নয়। বোস এখানে একটু—বিশ্রাম করে চান খাওয়া দাওয়া কর তারপর না হয় যাওয়াই যাবে।

বেদনা ক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখে জোর করে হাসির রেখা টেনে সমরেশ বল্লে, তা'হলে যাবি তো ঠিক্, কিন্তু এই দুপুরের ট্রেণেই।

সারা রাত্রি কাটলো তোর ট্রেণে, আবার এখুনি যাবি? বরং দুপুরটা বিশ্রাম কর; রাত্রির ট্রেণে না হয় যাওয়া যাবে। একজনের সেবা করতে গিয়ে নিজের জীবনের ওপর এমনি ভাবে অত্যাচার করাও যুক্তিসঙ্গত নয়; ধর তোরই কোন একটা অসুখ বিসুখ হঠাৎ করে বসে!

তৃষ্ণায় সমরেশের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, কথা কইতেও তার কষ্ট হচ্ছে; সে বল্লে, কষ্ট আমার হচ্ছে না প্রকাশ। তুই আর বেশী দেরী করিস নি। যাতে তিনটের গাড়ীতে আমরা যেতে পারি সেই ব্যবস্থাই কর। একটু থেমে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার সে বল্লে, নন্দিতা যদি সেরে ওঠে, তবেই জানবো আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

পিঠে একটা থাপড় মেরে প্রকাশ বল্লে, বেশ দুপুরেই যাব। এখন বোস তুই একটু, আমি আসছি। এই বলে প্রকাশ বাড়ীর ভেতর গেলো। সমরেশ দেওয়ালে টাঙান ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে বারোটা বেজে পনর মিনিট হয়েছে।

ষোলো

দূরে ঘরের কোণে পাশাপাশি দু'খানা চেয়ারে বসে প্রকাশ ও সমরেশ গল্প করছে। সমরেশ প্রকাশকে ভর্ৎসনার সুরে বল্লে, প্রকাশ, সত্যি তুই একটা ইডিয়েট—একটা আস্ত আহাম্মুক।

তুই যা বলছিস, আমি মেনে নিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর এমন কিছুই হয়নি, যার জন্যে ও একেবারে সংস্রব উঠিয়ে দিলো; চিঠিপত্র লেখা বন্ধ করলো এবং এমনিভাবে আমাকে শাস্তি দিলো।

নন্দিতা অভিমান করেই না হয় চলে এলো কিন্তু তাই বলে তুইও রইলি ওর ওপর রাগ করে বসে!

বারে মান অভিমান বা রাগারাগি হতে যাবে কেন?

তবে? জিজ্ঞাসুনেত্রে সমরেশ তাকালো প্রকাশের দিকে!

নন্দিতা হঠাৎ বল্লে, আমার ভাল লাগছে না এখানে থাকতে—আমি বাবার কাছে যাব। কোন দিনই আমি ওর মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিনি; কাজেই হেসে বল্লুম, বেশতো যাবে। ওযে আমার ওপর অভিমান করেছিলো, তা তখন আমি কেমন করে বুঝবো?

লোকের রোগ চিকিৎসা করিস তুই; কিন্তু এমনি অজ্ঞ যে, আমরা যে খবরটা জানতে পারি, তোরা তার বিন্দু-বিসর্গও টের পাস না। নন্দিতা চলে এলো এখানে আর তুই

মাথার ঝক্কিটা হটাতে পেরেছিস ভেবে মহানন্দে পসারে মন দিলি। এদিকে বৌ মলো, কি রইলো তার খবরটা পর্য্যন্ত রাখা প্রয়োজন মনে করলি না।

আমি ভাবলুম, রাগ যদিই বা করে থাকে, কয়েকমাস গেলে রাগ নিশ্চয়ই পড়ে যাবে—তখন বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যাব কলকাতায়। কয়েক মাস ধরেই এখানে আসবো ভাবছিলুম, কিন্তু কাজের ঝঞ্ঝাটে তা হয়ে ওঠেনি। কি জানি কেন, নানান দুশ্চিন্তায় মন আমার বড় খারাপ হয়েছিল কয়েকদিন আগে থেকে। এখানে আসবার জন্যে আমি ব্যবস্থা করছিলুল, এমনি সময় তুই গেলি। আমার কৃত-কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে অনুশোচনায়, এখন যদি নন্দিতাকে সারিয়ে তুলতে পারি, তা'হলেই বুঝবো আমার চেষ্টা, আমার ডাক্তারি-করা সার্থক। আর তা না পারলে যেখানে দুচোখ যায় চলে যাবো।

সমরেশ জিজ্ঞেস করলে, নন্দিতা সারবে তো?

আশা তো করি ভাই; তবে সময় লাগবে বেশ কিছুদিন। মাথার গোলমাল দু'একবছর থাকবে বলে মনে হয়—তবে একটু একটু করে ওটা সেরে যাবে।

হঠাৎ নন্দিতা চীৎকার করে ওঠে, ওকি! বাড়ীতে সানাই বাজছে কেন?

তার জ্ঞান হয়েছে দেখে সকলেই একসঙ্গে তার বিছানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। মাসিমা তাঁর মাথায় হাত

বুলোতে বুলোতে উত্তর দিলেন, ও সানাই নয় মা, শাঁখের আওয়াজ—সন্ধ্যে হয়েছে কিনা!

মুখে চোখে বিরক্তির ভাব এনে নন্দিতা বল্লে, তোমরা সবাই কি কালা! আমি স্পষ্ট শুনছি সানাই, আর তোমরা বলছো শাঁখ! আচ্ছা, বিয়ে বাড়ী না হলে কি লোকে মিছেমিছি এতগুলো আলো এক সঙ্গে জ্বেলে রাখে?

সকলে এক সঙ্গে চারধারে তাকিয়ে দেখলো। ঘরে একটা আলো ছাড়াতো দ্বিতীয় আলো কোথাও নেই। নমিতার মা কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সমরেশ ইসারায় তাকে নিষেধ করলো। উত্তর দিলো নমিতা, হয়তো কারুর বিয়ে হবে!

তার দিকে তাকিয়ে নন্দিতা বল্লে, বাড়ীতে বিয়ে! তা আমাকে সাজতে হবে না! বর সাজাবে কে? তুমি?

না দিদি, তুমি।

হ্যাঁ আমাকেই তো সাজাতে হবে—বৌকে বরণ করে ঘরে তোলবারও ভার আমার, না'হলে সে রাগ করবে; ভাববে আমি বড় স্বার্থপর।

নমিতা সমরেশের দিকে তাকায়। সমরেশের চোখ দুটো ছলছল করে আসে।

একটু থেমে নন্দিতা বল্লে, তোমরা সকলে অমন করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছো কি? চুলটা আমার

এখনও কেউ বেঁধে দিলে না! কৈ আমার কাপড়-চোপড় নিয়ে এসো!

তারপর নিজের কাপড়টার দিকে দেখে বল্লে, ছিঃ, এ কাপড়-চোপড় কি আজকের দিনে পড়তে আছে? লোকে ভাববে কি!

সে উঠে বসবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। নিজের অক্ষমতা দেখে সে জিজ্ঞেস করলে, একি! আমি উঠতে পারছি না কেন?

প্রকাশ বল্লে, তোমার যে অসুখ করেছে।

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে নন্দিতা বল্লে, কি অসুখ! কৈ আমি তো কিছুই জানি না।

• কিছু না—এমনি শরীর খারাপ।

প্রকাশের দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করলে, আপনি বুঝি ডাক্তার, আমাকে দেখতে এসেছেন!

একথার উত্তর সে কি দেবে! অতর্কিতে চোখের কোলে তার জল এসে জমেছিল। নন্দিতার অগোচরে রুমালে চোখ মুছে নিয়ে প্রকাশ বল্লে, হ্যাঁ আমি ডাক্তার--তোমার চিকিৎসা করছি।

সমরেশের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে নন্দিতা জিজ্ঞেস করলে, আর উনি কে?

ও সমরেশ।

কথাটা শুনে নন্দিতা চমকে উঠলো। ওঁকে চলে যেতে

বলুন এখান থেকে, ডাক্তারবাবু—আমার ভাল লাগছে না, বলে নন্দিতা পাশ ফিরে শোয়।

নন্দিতার কথাগুলো সমরেশের বুকে শেলের মতো বিঁধলো। সে ভাবছে, নন্দিতার জন্যে দায়ী আর কেউ নয়, সে নিজে। সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

কেউ কোন কথা কয় না—সকলে এ-ওর মুখ চাওয়া-চায়ি করতে লাগলো। শুধু দেওয়ালে টাঙান ঘড়িটা নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে টক্ টক্ করে চলেছে।

একটু পরে নন্দিতা ডাক্তারের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলে, আমি ভাল হবো তো ডাক্তার বাবু?

প্রকাশ হেসে বল্লে, নিশ্চয়ই ভাল হবে!

আচ্ছা, একি হলো বলুনতো আমার—কোন কিছুই ভাবতে পারছি না। যা ভাবছি, খানিক পরে সেটা যাচ্ছে গুলিয়ে, আসছে নতুন একটা কিছু; সেটাও যাচ্ছে মিলিয়ে—আসছে আর একটা ভাবনা। এমনি চলেছে মনের মধ্যে। কতকগুলো জিনিস আমি একসঙ্গে ভেবে চলেছি; কি যে ভাবছি, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না, বোঝাতেও পারছি না কাউকে।

ও কিছু নয়, পাংশুমুখে প্রকাশ উত্তর দিলো।

কিন্তু এ রকমই বা হচ্ছে কেন?

তুমি ভয়ানক দুর্ব্বল, তাই না! ও সব ছেড়ে দিয়ে

একটু ঘুমাবার চেষ্টা করো। দেখবে কাল সকালে সব কিছু ভাল হয়ে গেছে।

প্রকাশের কথাগুলো মনোযোগের সঙ্গে শুনে নন্দিতা বল্লে, তা না হয় হলো; কিন্তু আমি কে তাই মনে নেই আমার—আচ্ছা আমার নাম কি ডাক্তার বাবু?

নন্দিতা।

নন্দিতা মাথা নেড়ে বল্লে, আপনি কিচ্ছু জানেন না। আমার নাম নন্দিতা হতে যাবে কেন? সে তো আর একটা মেয়ে—আগেই মরে গেছে। আমার নাম···আমার···নাম।

ষ্টেথিসকোপটা বুকে বসিয়ে পরীক্ষা করতে করতে প্রকাশ জিজ্ঞেস করলে, তা' হলে কি নাম তোমার?

'আনন্দে হাততালি দিয়ে নন্দিতা বল্লে, মনে পড়েছে এবার—আমার নাম সীতা।

আপন মনে প্রকাশ বল্লে, তা' না হলে এত দুঃখ সও।

প্রকাশের হাত থেকে ষ্টেথিসকোপটা রেগে ফেলে দিয়ে সে বল্লে, কী! আমার নাম সীতা—আপনি বিশ্বাস করেন না?

কে বলেছে করি না? আমি শুধু বল্লুম, দেখেছো, তোমার নামটা পর্য্যন্ত ভুলে গেছি!

ডাক্তারের একখানা হাত ধরে বল্লে, তাই বলুন! সত্যি আপনাকে আমার বড্ড ভাল লাগছে—আপনি বেশ লোক। নন্দিতা চোখ বুজলো।

প্রকাশ আর কোন কথা বল্লে না; শুধু একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেল্লে।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। সকলে নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে থাকে নন্দিতার মুখের দিকে তাকিয়ে। কেউ কোন কথা বলতে সাহস করে না, পাছে কথা শুনে সে আবার বাজে বকতে আরম্ভ করে। বিরক্তিভরে নন্দিতা বল্লে, বড় মুস্কিলে আমি পড়লুম যা'হোক। সকলে মিলে চারধারে শুধু ফিস্ ফিস্ করে কি যেন ষড়যন্ত্র করছে—কি করেছি আমি বলতে পারেন ডাক্তার-বাবু ?

ও তোমার মনের ভুল—কৈ কেউ তো কোন কথাই বলে নি !

তবে কি বলতে চান আমি পাগল—যা তা বকছি। সব কথাই আমার হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন ?

বড্ড বাজে বকো তুমি—আমি কি তাই বলছি! প্রকাশ বল্লো; আর তপ্ত একফোঁটা জল তার চোখের কোল বেয়ে নন্দিতার গণ্ডে পড়লো।

ডাক্তারের অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে নন্দিতা বললে, এখানকার আবহাওয়া আমার ভাল লাগছে না ডাক্তারবাবু, কেবলি আমার ভয় করছে সব সময়। আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করুন—তা না হলে আমি বাঁচবো না।

কোথায় যেতে চাও তুমি, বলো ?

তাও তো মনে করতে পারছি না। আপনি বলুন না কোথায় গেলে শান্তি পাব।

তোমার শ্বশুর বাড়ী।

সে কোথায় ; আমি তো জানি না !

কোলকাতায়।

নন্দিতা খানিকক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলো ! তারপর বল্লে, তা'হলে সেখানেই নিয়ে চলুন ; কিন্তু আপনিও তো সেখানে যাবেন ?

হ্যাঁ আমাকে তো যেতেই হবে। আমি ডাক্তার, না গেলে কে তোমার চিকিৎসা করবে ?

তবে যান আর দেরী করবেন না ; যাবার ব্যবস্থা করে ফেলুন। আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নি। বলে সত্যই নন্দিতা পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুজলো।

প্রকাশ ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে বারণ্ডার রেলিং ধরে আকাশের দিকে মুখ করে সমরেশ কি ভাবছে। প্রকাশ কাছে যেতেই সে জিজ্ঞেস করলে, কেমন বুঝলে ?

চিন্তা করতে করতে প্রকাশ বল্লে, মাথাটা খারাপই হয়ে গেছে সমরেশ। তবে এই আশা, যে মাঝে মাঝে দু'একটা ভাল কথা কয়। আবার সব খেই হারিয়ে ফেলে—কি বলতে কি বলে ফেলে। হ্যাঁ, তবে ওকে কোলকাতায় নিয়ে যাবারই ব্যবস্থা করতে হবে।

কেন, এখানে থাকলে চিকিৎসার সুবিধে হবে না?

একটু অসুবিধে এখানে হবে বৈকি? ওষুধ পত্র সব সময় ঠিকমত দাম দিয়েও পাওয়া যাবে না। তাছাড়া কোলকাতায় নিয়ে গেলে দু'চারজন বড় ডাক্তার দেখানো যেতে পারে। সেখানকার ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে যাতে রোগটা তাড়াতাড়ি সারে সেদিকে দেখতে হবে। এভাবে তো বেশী দিন ফেলে রাখা যায় না। তাছাড়া এখানে ও থাকতে চাইছে না। অন্য কোথাও যেতে চায়।

যা ভাল বুঝিস কর; কিন্তু যোগেনবাবু এখানে একা থাকবেন কি করে?

তাঁকেও নিয়ে যাবো সঙ্গে করে আমাদের ওখানে; যতদিন না নন্দিতা সম্পূর্ণ সেরে ওঠে তাঁকে ওখানেই থাকতে হবে। আর তুইও চল না সঙ্গে। ছুটীতো এখনও দিন কতক বাকী রয়েছে।

সমরেশ উত্তর দিলো, না ভাই, এখন আর আমি যাব না। আমাকে তাড়াতাড়ি একটু এলাহাবাদে ফিরতে হবে—জরুরী কাজ রয়েছে কলেজ খোলবার আগে। সামনের ছুটীতে পারিতো তোদের এখানে গিয়ে উঠবো। ভগবান করুন, তখন যেন গিয়ে দেখি নন্দিতা সুস্থ হয়ে গেছে।

সমরেশ ধীরে ধীরে বারণ্ডা থেকে নেমে রাস্তার দিকে এগোতে থাকে। প্রকাশ সেখানে কয়েক মুহূর্ত

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আবার নন্দিতার বিছানার পাশে গিয়ে বসলো।

রাস্তায় এসে সমরেশ সামনের খোলা মাঠটার দিকে তাকিয়ে দেখে বিপুল জ্যোৎস্না মখমলের মত সবুজ ঘাসের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। ঝির ঝির করে বাতাস বইছে আর দূর থেকে বয়ে আনছে অনাঘ্রাতা কুসুমের মধুর সুরভি। চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে, গাছপালা তরুলতা শাখা দুলিয়ে পথিককে আনন্দ বাসরে যোগ দেবার জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

প্রকৃতির এ রূপ-লাবণ্যে বিমুগ্ধ হয়ে সমরেশ পূর্ব্বে বহু সুখ-কল্পনা করেছিল। কিন্তু এখন তা মৃত্যুর মত শীতল ও বিষাদময়ী। তার দিকে তাকালে সমরেশের প্রাণে আনন্দ হিল্লোল না তুলে তার বুকের ভেতর কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। সমরেশ তাকিয়ে দেখে পশ্চিম আকাশে একটী তারা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। নীল তার আভা। লোকে বলে, ঐ তারার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে মানুষ পার্থিব শোকদুঃখ ভুলে যায়, পুলক শিহরণে হৃদয় চঞ্চল হয়ে ওঠে—এমনি এক মায়া আছে ওর মধ্যে। কিন্তু তার আজ সেদিকে তাকাবার সাহস নেই।

সমরেশ তাকিয়ে দেখে চারিদিকে অন্ধকার—কোথাও যেন এক টুকরো আলো নেই। সমরেশ ভয়ে শিউরে

ওঠে—চোখ দুটো বুজে আসে। পায়ের তলায় পৃথিবীটা যেন কাঁপতে থাকে।

সমরেশকে তারপর আর সে বাড়ীতে দেখা যায়নি। জীবনের পথে চলতে চলতে মানুষের অনেক ভুল-ভ্রান্তি হয় এবং যার বোঝা মানুষকে সারা জীবনই বহন করতে হয় চোখের জল ফেলে। নন্দিতা ও সমরেশ উভয়ে জীবনে ভুল করেছিল; কিন্তু ও ভুল যেন আর কেউ না করে।

সমাপ্ত